বিয়ে

আবেগ ও বাস্তবতা

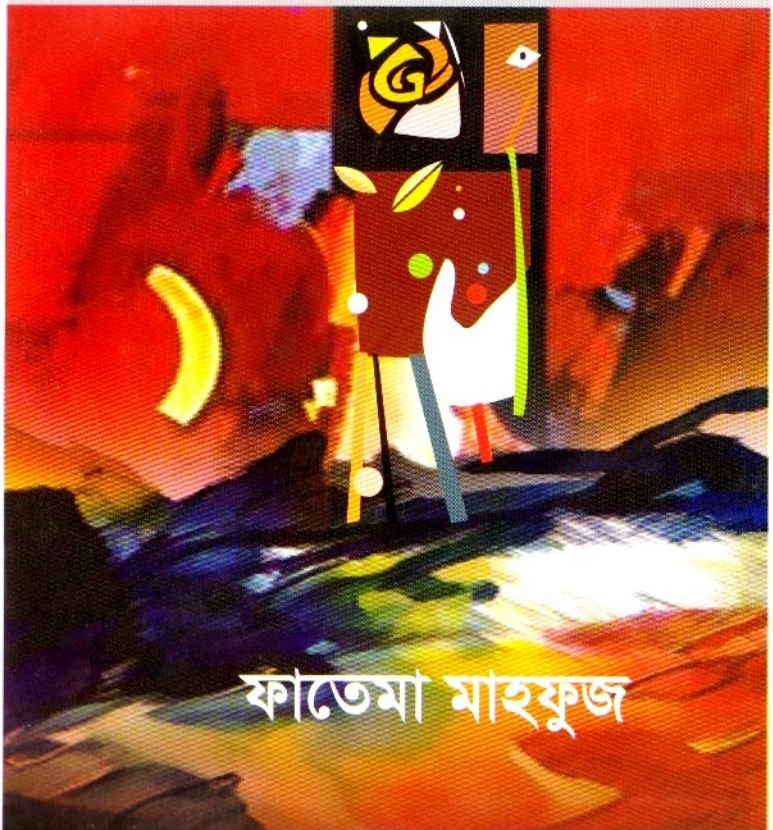

ফাতেমা মাহফুজ

লেখক পরিচিতি

ফাতেমা মাহফুজ একজন প্রগতিশীল লেখিকা ও সমাজচিন্তক। পুরান ঢাকার নবাব কাটরায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে তার জন্ম। তিনি ঐতিহ্যবাহী আনোয়ারা বেগম মুসলিম উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় থেকে এসএসসি এবং ঢাকা সিটি কলেজ থেকে এইচএসসির গণ্ডি পেরিয়ে ইডেন মহিলা কলেজ থেকে পদার্থ বিজ্ঞানে অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন।

নির্বাচিত একটি বিষয় নিয়ে চারপাশের বাস্তবতার আলোকে বিস্তারিত লেখার প্রতিভা সেই স্কুল জীবন থেকেই। ফলে স্কুলে রচনা প্রতিযোগিতায় তার প্রথম হওয়ার রেকর্ড রয়েছে। পরবর্তীতে দৈনিক পত্রিকার সাপ্তাহিক সংখ্যায় লেখার মাধ্যমে মিডিয়ায় লেখা শুরু। পরবর্তিতে বিভিন্ন অনলাইন নিউজ পেপারে সাংবাদিকতার দায়িত্ব পালন করেন। দৈনিক নয়া দিগন্তে নিয়মিত লেখার সুবাদে পত্রিকাটির সাপ্তাহিক পাতা 'নারী'র পক্ষে সাংবাদিকতা করেন। এরই মধ্যে সামহোয়্যারইন ব্লগ, সোনার বাংলাদেশ, আমার বর্ণমালা, টুডে ব্লগ ও বায়ান্ন ব্লগে ব্লগার হিসাবে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেইসবুকে তিনি দারুণ জনপ্রিয়।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বিবাহিত। এক কন্যা সন্তানের জননী। আদর্শ সমাজ গড়ার প্রত্যয় পরিক্রমায় এই বইটি তার প্রথম প্রকাশ। এরই মধ্যে প্যারেন্টিংয়ের ওপর লেখা একটি বইয়ের কিছু অংশ তিনি অনুবাদ করেছেন। বইটির প্রথম পর্ব বেরিয়েছে। লেখকের আরেকটি অনুদিত বই প্রকাশের অপেক্ষায়।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বিয়ে

আবেগ ও বাস্তবতা

ফাতেমা মাহফুজ

www.pathagar.com

বিয়ে: আবেগ ও বাস্তবতা
ফাতেমা মাহফুজ

প্রকাশনা:
প্যানসফি
(অস্থায়ী) কার্যালয়: এসই-২৮, চবি ক্যাম্পাস
০১৯২৮৬৭২৪০৫

প্রথম মুদ্রণ :
ফেব্রুয়ারি ২০১৭

স্বত্বাধিকার:
লেখক

মুদ্রণ:
সাইলেক্স
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম

মূল্য: ১২০ টাকা

Biye: Abegh O Bastobota (*Marriage: Emotion and Reality*), Writer: Fatema Mahfuz, Published by Pansophy, 1st edition. Price: Tk 120.

www.pathagar.com

স্মরণে –
যুগে যুগে যারা সুষ্ঠু সমাজ গঠনে অবদান রেখেছেন...

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মুখবন্ধ

ফাতেমা মাহফুজ এক অসাধারণ সমাজকর্মী ও লেখিকা। সে তার বিবাহের পূর্বেই বিবাহ বিষয়ক অনেক জটিল বিষয় আলোচনা করেছে। তার কয়েকটি প্রবন্ধের শিরোনাম হলো, 'বায়োডাটা দেখে যায় না চেনা', 'ঘটক যখন ডাকাত', 'দাড়ি রাখলে বিয়ে হয় না', 'টাকার মোহে মা-বাবারাও অন্ধ', 'আমরা যখন মাথার বোঝা', 'আমার বউ কালো'। এতেই বুঝা যায়, বিবাহ সম্পর্কিত বিষয়গুলো নিয়ে সমাজে যে ব্যাপক সমস্যা রয়েছে, লেখিকা সেটা অল্প বয়স থেকেই চিন্তা করেছে।

আমি বইটি পড়ে দেখেছি। তার আলোচনা খুবই বাস্তব। সে প্রত্যেক সমস্যার গভীরে যাওয়ার চেষ্টা করেছে। তাই আশা করি, বইটি পড়লে সবাই উপকৃত হবেন।

প্রায় এক বছর আগে তার বিয়ে হয়েছে। তাছাড়া সে আমার এক মরহুম বন্ধুর নাতনী। অন্যদিকে সে আমার ছাত্রী। ইসলাম বিষয়ে আমি তাকে আরো জানাতে চেষ্টা করি। তাছাড়া আমার উপলব্ধি, সে বাংলাদেশের একজন শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ হওয়ার যোগ্য।

আমি অন্তর থেকে তার জীবনের অগ্রগতি, শান্তি ও কল্যাণ কামনা করছি।

২ আগস্ট ২০১৬

শাহ আবদুল হান্নান
সাবেক সচিব, বাংলাদেশ সরকার
চেয়ারম্যান, মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

প্রতিশ্রুতিশীল লেখক ফাতেমা মাহফুজের এটি প্রথম গ্রন্থ। আমাদের সমাজে বিয়ে সংক্রান্ত নানা অসংগতির ওপর দরদী মন নিয়ে তিনি আলোকপাত করেছেন। এখানে সংকলিত নিবন্ধগুলোতে বিশেষ করে নারীদের দায়িত্ব ও অধিকারের বিষয়ে তার সমন্বয়ধর্মী দৃষ্টিভংগী ফুটে উঠেছে।

বিয়ে হলো সমাজ গঠনের ভিত্তি। বিশেষ করে আফ্রো-এশীয় মহাদেশসমূহের ধর্ম-নির্বিশেষে সব ধরনের সমাজ ব্যবস্থার জন্যই এটি সত্য। নারী-পুরুষের সম্পর্কভিত্তিক সামাজিক ব্যবস্থাই এই উভয় অ-ইউরোপীয় সভ্যতার অভিন্ন বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ জাতি, ধর্ম, বর্ণ, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা নির্বিশেষে আমাদের জীবনে পরিবারই আশ্রয়কেন্দ্র ও সুখ-শান্তি-প্রেরণার উৎস। আমাদের পারস্পরিক যোগাযোগ ও পরিচয়ে পরিবার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

দুজন সক্ষম নারী-পুরুষের মধ্যে বিয়ের মাধ্যমে পরিবার নামক এই সামাজিক সংস্থা গড়ে উঠে। একক বিবাহের তুলনায় বহুবিবাহ একটি ব্যতিক্রমী প্রথা হলেও তা নারী-পুরুষেরই মধ্যকার সম্পর্ক বিশেষ। লাগামহীন ভোগবাদিতার উন্মাদনায় হাল নাগাদের ইউরোপ-আমেরিকায় পৃথিবীর এই প্রাচীনতম সামাজিক প্রতিষ্ঠান ভেংগে পড়েছে। যদিও এর অস্তিত্ব সেখানে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। সেখানে সমলিঙ্গে বিয়েকে আইনসম্মত করা হয়েছে। বিবাহ বহির্ভূত 'বৈধ' সম্পর্ক তো আছেই। এই সর্বনাশা প্লাবনের সমাপ্তি কখন কীভাবে হবে তা জানি না। কিন্তু এটি নিশ্চিত যে, এটি মানব সভ্যতাবিরোধী একটা ব্যতিক্রমী নেতিবাচক সভ্যতা। আমাদের সমাজ এর কুপ্রভাব থেকে এখনো মুক্ত। তাই সংগত কারণেই লেখক এ বিষয়ে এই বইয়ে কোনো প্রবন্ধ লিখেন নাই।

এই বইয়ে তিনি আন্তঃধর্ম বিয়ের সমস্যা নিয়ে লিখেছেন। একই দেশের মধ্যকার হলেও ভিন্ন অঞ্চলের ছেলে-মেয়ের বিয়েতে উদ্ভূত সাংস্কৃতিক সংকটের কথা তিনি হয়তোবা লক্ষ করেন নাই। হয়তোবা পরবর্তী সংস্করণে তিনি এ বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করবেন।

"বিয়েকে সহজ করো। ব্যভিচারকে কঠিন করো"– নবী মোহাম্মদের (সা) এই অমূল্য হেদায়েতকে যদি আমরা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে একটা সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চাই, তাহলে অনেক কষ্ট করতে হবে, অনেক দূর যেতে হবে। বাহুল্য খরচের ব্যাপারটা বিলম্ব বিয়ের মূল কারণ। খরচের এই অপসংস্কৃতি ভাংগার কাজে সবচেয়ে বেশি কার্যকর ভূমিকা রাখতে

www.pathagar.com

পারে সংশ্লিষ্ট বর ও কনে। এই দায়িত্ব কনে পক্ষেরও নয়, বর পক্ষেরও নয়। পুরো ব্যাপারটির স্বয়ং প্রথমপক্ষ হওয়ার সুবাদে এক একজন সচেতন ও সৎ বর-কনেই এই দুষ্টচক্র ভাংগার কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে।

পাত্র-পাত্রীর কোনো সম্মতি না নিয়ে একতরফাভাবে অভিভাবকদের মাধ্যমে আয়োজিত বিয়ের যে প্রাচীন প্রান্তিকতা, তার বিপরীতে আজকাল শুধুমাত্র দুজনার পছন্দের ভিত্তিতে 'ভালবাসার বিয়ে'র ঘটনাও দেখা যায়। বিয়ে পরবর্তী জীবন হলো কঠোর বাস্তবজীবন। আবেগ সেখানে ততটা মূখ্য নয়। সংসারের নানা রূঢ় বাস্তবতার মোকাবিলাই সেখানে দৈনন্দিন ব্যাপার। বিয়ে মানে দুজন নর-নারীর দায়-দায়িত্বহীন শারীরিক সম্পর্কমাত্র নয়। বিয়ে মানে নতুন একটা পরিবার গঠনের মাধ্যমে বিদ্যমান দুটো পরিবারের সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক আন্তঃসম্পর্ক।

বর ও কনের ভাষা থেকে খাদ্যাভ্যাস– এক কথায় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বহু বিষয়ের ফরমেশনে তাদের গড়ে উঠা পরিবারের মৌলিক প্রভাব থাকে। তাই তাদের মধ্যকার মিলমিশের জন্য সংশ্লিষ্ট দুই পরিবারের সামাজিক সমতা তথা কুফুর গুরুত্বও অনেক বেশি। ভালবাসার বিয়েতে কুফুর এই দিকটাতে যথাযথ গুরুত্ব দেয়া হয়ে উঠে না। তরুণ-তরুণীর আবেগই সেখানে প্রাধান্য পায়। সেজন্য বিয়ের ব্যাপারে আমি সামাজিক বিয়ের (arranged marriage) পক্ষপাতী। যে অভিভাবকরা জন্ম হতে আপনার বেড়ে উঠা ও প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সব পর্যায়ে আপনার জন্য সম্ভাব্য সবচেয়ে ভালোটাই করতে পারলেন, তারা আপনার জীবনসঙ্গী বাছাইয়ের কাজে শুধু মোনাজাত-আশীর্বাদেই থাকার যোগ্য, কীভাবে এটি আপনারা ভাবতে পারলেন?

বিয়ে নিয়ে ছাব্বিশটা নিবন্ধের এই বইটা প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত। এর মাধ্যমে প্রকাশনা জগতে প্যানসফি'র যাত্রা শুরু। সাধারণ থেকে একাডেমিক– সব ধরনের বই আমরা ছাপাবো। আশা করি, কলেবরে ছোট হলেও থট প্রভোকিং এই বইটা আপনাদের ভালো লাগবে। আসলে এর প্রত্যেকটা বিষয় নিয়ে এক একটা স্বতন্ত্র ও বিস্তারিত বর্ণনাসমৃদ্ধ গ্রন্থ রচিত হওয়া জরুরি।

২৫ জানুয়ারি ২০১৭
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক
mozammelhoque.com

www.pathagar.com

ভূমিকা

যখন অনার্সে পড়ি তখনই সামাজিক ইস্যু নিয়ে আমার চিন্তাভাবনা দেখে একজন লাইব্রেরিয়ান বই লেখার প্রতি উৎসাহিত করেন। সেই থেকে আমার মধ্যে বই বের করার মানসিকতা ছিল। তবে লেখালেখির শুরু দৈনিক পত্রিকা, ফেসবুক ও ব্লগে। এতে অনেকের সাড়া পাই। শুভাকাঙ্ক্ষীদের কারো কারো মন্তব্য ছিলো, "তুই এমন বিষয় নিয়ে লেখিস, যেগুলো সচরাচর কেউ লেখে না। কথাগুলো আমাদের ভিতরে থাকে, কিন্তু লেখতে পারি না। তুই লেখে যা...।" অবশেষে আল্লাহর রহমতে আমার লেখাগুলো বই আকারে প্রকাশিত হচ্ছে।

আমি লক্ষ করেছি, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কিংবা সামাজিক যে কোনো সমস্যার মূলে রয়েছে পারিবারিক সমস্যা। কারণ, একটা মানুষ পরিবার থেকেই উঠে আসে। সমস্যায় জর্জরিত কোনো পরিবার তার সদস্যদের স্বস্তি দিতে পারে না। এক অর্থে পরিবারে বিদ্যমান সমস্যার ক্ষেত্রে ভুলটা হচ্ছে শুরু থেকেই, পরিবার গঠনের প্রারম্ভিক ধাপ তথা 'বিয়ে' থেকেই। তাই আমি সমস্যার গোঁড়া থেকেই শুরু করেছি। সমাজ সংস্কারের জন্যে প্রবীণ থেকে নবীন সবারই সচেতনতা দরকার। যে সচেতনতার অভাবে যুবসমাজ এখন বিষন্নতার বেড়াজালে আবদ্ধ।

পরিশেষে, ধন্যবাদ জানাই আমার পরিবার, প্রকাশক ও শুভানুধ্যায়ীদের যারা পাশে থেকে আমাকে অনেক সহযোগিতা করেছেন।

৮ জানুয়ারি, ২০১৭

ফাতেমা মাহফুজ
ঢাকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বিষয় সূচি

বায়োডাটা দেখে যায় না চেনা	১৩
বিয়ের আগে সাক্ষাৎকার	১৬
ঘটক যখন ডাকাত	১৯
বিয়ে বন্ধ করে রেখেছে	২১
দাড়ি রাখলে বিয়ে করা যায় না	২৩
ইতি,আপনার একান্ত অনুগত...	২৫
টাকার মোহে মা-বাবাও অন্ধ	২৮
অল্প বয়সে বিয়ে: সমস্যা কোথায়?	৩১
বিয়ের বয়স ১৬, ১৮ নাকি ২০?	৩৬
বিয়ের আগে ভালোলাগা	৩৯
আন্তঃধর্ম ভালোবাসার পরিণতি	৪০
আমরা যখন মাথার বোঝা	৪৩
মোহরানা পাঁচ লাখ টাকা	৪৫
সমস্যা বরের নয় বউয়ের	৪৯
পরশ্রীকাতরতা	৫২
বিয়ের দাওয়াত যেনো গিফটের বিনিময়ে খাদ্য	৫৩
বৈবাহিক বিষন্নতা	৫৫
এটা কি মানসিক রোগ?	৫৭
নবদম্পতিদের জন্য	৫৯
আমরা যারা ফ্রি মাইন্ডেড	৬১
আমি যেমন সেও তেমন	৬৩
আমার বউ কালো	৬৫
এমন দৃষ্টান্ত হয়ত বিরল	৬৬
আধিপত্য বিস্তার: শাশুড়ি বনাম বউ	৬৭
তালাক: স্বাধীনতা নাকি স্বেচ্ছাচারিতা?	৭১
আমার বিয়ের সাক্ষাৎকার	৭৬

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বায়োডাটা দেখে যায় না চেনা

আমরা সবাই উত্তম জীবনসঙ্গী কামনা করি। কিন্তু এই কামনার পেছনে চেষ্টাসাধনা করি না। আমাদের প্রথম ব্যর্থতা ও অজ্ঞতা ধরা দেয় বায়োডাটা লেখার ক্ষেত্রে। হাস্যকর নয় বরং অবাক করার মতো ব্যাপার হচ্ছে বিবাহে ইচ্ছুক পাত্র বা পাত্রী নিজের বায়োডাটা পর্যন্ত সঠিকভাবে লিখতে জানেন না। যে কারণে বায়োডাটা দেখে বুঝা যায় না, মানুষটি কেমন!

বায়োডাটার মধ্যে নাম, ঠিকানা ও শিক্ষাগত যোগ্যতার মতো খুব সাধারণ বিষয়ের বাইরে ব্যতিক্রমী কিছু বিষয়ও নিয়ে আসা দরকার। যেমন-

আমি মানুষটা কেমন?
আমার শখ কী?
আমি কেমন জীবনসঙ্গী কামনা করি?
নিজের জীবন নিয়ে আমার পরিকল্পনা কী?

উপরের প্রশ্নগুলো নিজেকে নিজে করে উত্তর তৈরি করা উচিত।

এবার উপরের প্রশ্নগুলো সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করা যাক। হতে পারে আপনি পড়ুয়া টাইপ কিংবা লেখক গোছের, গল্প-উপন্যাস-সাহিত্য পড়তে পছন্দ করেন। হতে পারে আপনি ধার্মিক প্রকৃতির কিংবা ধর্মতত্ত্বের বিশ্লেষক। কিংবা আপনি ভালো সংগঠক। আপনার আড্ডা দিতে ভালো লাগে। দেশ-বিদেশের সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, কূটনীতি নিয়ে ভাবেন। হতে পারে আপনি ভাবুক টাইপ কিংবা নতুন নতুন জায়গায় ঘুরতে পছন্দ করেন। আবার হতে পারে আপনি নির্দিষ্ট কোনো খেলা পছন্দ করেন বা খেলাধুলা করেন। ইত্যাদি বিভিন্ন টাইপের লাইফ স্টাইল আপনার থাকতে পারে। তাই আগে নিজেকে প্রশ্ন করুন, আপনি আসলে কী? আপনি কেমন? নিশ্চয়ই আপনি সবার মতো নন। আপনার একটা আলাদা পরিচয় আছে। অতঃপর 'About myself' পয়েন্ট উল্লেখ করে নিজের ব্যাপারে সংক্ষেপে লিখুন। যাতে অপর ব্যক্তি আপনার ব্যাপারে একটা ধারণা পায়। তেমনি 'My hobby' কিংবা জীবনসঙ্গীর দিক থেকে আপনার 'Expectation'– এসব পয়েন্ট উল্লেখ করে লিখুন। যাতে অপরপক্ষের জন্যে আপনাকে বাছাই করা সহজ হয়।

অনেকে হয়ত ভাবছেন, 'ধুর! এতো কিছু লেখার দরকার কী? এসব আবার মানুষ লেখে নাকি?' এমনকি পরিবারের কর্তারাও হয়ত আপনার এরূপ বায়োডাটা লেখার ক্ষেত্রে বাঁধ সাধতে পারে। বলতে পারে, 'আজাইরা প্যাঁচাল বাদ দে!' যদিও এগুলো যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ

www.pathagar.com

বিষয়। কারণ, পাত্র বা পাত্রী দেখতে কেমন, তাদের বংশ কিংবা সম্পত্তি (হ্যাঁ, বিয়ের ক্ষেত্রে এগুলো দেখা হয়) ইত্যাদি বাইরে থেকে বুঝা যায়। এসবের সাথে সাথে ব্যক্তির মানসিকতা কেমন তা কিন্তু ব্যক্তিকে নিজের ভালোর জন্যেই অন্যকে জানিয়ে দেয়া উচিত। বিশেষ করে বিয়ে করার ক্ষেত্রে এটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, একটা মানুষের সাথে হয়ত আপনার শতভাগ মিলবে না, কিন্তু তারপরও নিজ থেকে জানিয়ে দেয়া কিংবা জেনে-বুঝে 'কবুল' করাই ভালো।

এবার অনেকেই হয়ত বলবেন, 'এসব বিষয় না লিখে, সামনাসামনি কথা বললেই তো হয়!' হ্যাঁ, তা তো হয়ই। তবে আফসোসের বিষয় হলো অনেক ছেলে-মেয়ে বিয়ের আগে কীভাবে আরেকজনের সাক্ষাৎকার নিতে হয় তাও জানেন না! কিছু পাত্র/পাত্রী তো নিজে সাক্ষাৎকার না নিয়ে মা-বাবা, ভাই-বোন, ভাবীকে পাঠায়। বলে, 'আমার ভয় লাগে, তোমরা কথা বলো।' মনে রাখা উচিত, কিছু কিছু জায়গায় ভয় নয়, সাহসিকতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে হয়। কারণ, বিয়েটা আপনি করছেন, আপনার মা-বাবা নয়। জীবনসঙ্গী নিয়ে আপনাকেই চলতে হবে। তাছাড়া নানা ধরনের বৈধ পন্থায় যেহেতু এ ধরনের যোগাযোগের সুযোগ আছে, সেখানে পিছপা হওয়া উচিত নয়।

আরেকটা বিষয় না বললেই নয়। অনেকেই বায়োডাটায় মিথ্যা জন্মতারিখ দেন। যে মিথ্যাটা তারা জন্মের পর থেকেই বয়ে চলছেন। হ্যাঁ, আমাদের অনেকের ক্ষেত্রেই মা-বাবা কিংবা স্কুল শিক্ষক সার্টিফিকেটে বয়স কমিয়ে দেন। তারা এমনটি করেন এই ভেবে যে, সরকারি খাতায় চাকরির বয়স বেশি থাকবে। যদিও মিথ্যার উপর কোনো কিছুই টিকে থাকে না। যতদিন আমাদের শরীরে জোর আছে আমরা পৃথিবীর কারো উপর নির্ভরশীল থাকবো না, একটা কিছু করে খাবোই, ইনশাআল্লাহ। যাইহোক, বায়োডাটা যেহেতু একটা সুন্দর জীবনের শুরুর জন্যে, তাই মিথ্যা তথ্য দিয়ে কাউকে 'আমি অনেক ছোট' – এমনটা বুঝানোর দরকার নেই। আর সার্টিফিকেট কিংবা পরবর্তীতে নিকাহনামায় একই তথ্য রাখলেও অন্তত বায়োডাটায় সত্যটা লিখুন।

এদিকে, কিছু ধোঁকাবাজ ছেলে-মেয়ে ও তাদের পরিবার আছে, যারা তাদের সন্তানদের ইতোপূর্বে বিয়ে হয়ে থাকলে, বর্তমানে তালাকপ্রাপ্ত হয়ে থাকলে বায়োডাটায় তা উল্লেখ করেন না। ভাবেন, এটা লিখলে আর বিয়ে হবে না। তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, অন্যকে ধোঁকা দিয়ে কখনো ভালো কিছু আশা করা যায় না। আপনার নিয়ত ভালো হলে আপনার অবস্থান জেনেই ইনশাআল্লাহ আরেকটি পরিবার আপনার সন্তানকে মেনে নেবে। তাই মিথ্যার আশ্রয় নিবেন না।

আরেকটা বিষয় না বললেই নয়। আমাদের মধ্যে অনেকেই আছেন যারা বৈধ পথে এগুতে ভয় পান বা গড়িমসি করেন, কিন্তু অবৈধ পথে এগিয়ে যেতে দ্বিধা করেন না। যেমন- অনেক পরিবারে দেখা যায়, মুরুব্বিরা পছন্দ করে মেয়েকে আংটি পরিয়ে আসার পর থেকেই ছেলে-

www.pathagar.com

মেয়ে মোবাইলে চুটিয়ে কথা বলা শুরু করে দেয়। যদিও তাদের মধ্যে আদৌ কোনো বৈধ সম্পর্ক নেই। অনেকে যুক্তি দেখায়, এবার আমরা একে অপরকে বুঝে নিই। সেক্ষেত্রে বলবো, বুঝে নেয়ার পর্বটা যেখানে সরাসরি পরিবারের সামনে প্রাথমিক পর্যায়েই করা যেতো, সেখানে গোপনে মোবাইলে পরপুরুষ কিংবা পরনারীর সাথে কথা বলায় কী লাভ? একটা সামান্য আংটি, সম্পর্কের কোনো ভিত্তি বা দলিল নয়। তাই পাত্র/পাত্রীর পারস্পরিক বোঝাপড়াটা প্রথম সাক্ষাতেই করা জরুরি। পরবর্তীতে কথা বলা কাবিনের পরেই করা উচিত।

আবার অনেক অভিভাবক সন্তানকে বলেন, 'তোর এতো পরীক্ষা করার কী আছে? যা বলার বা জিজ্ঞাস করার, তা আমরাই করবো।' এমন কর্তারাই নিজের সন্তানদের না সাক্ষাৎকার নিতে দেন, আর না ছেলে-মেয়ে একান্তে কথা বলে নিক – তেমন পরিবেশ সৃষ্টি করে দেন। কী পরিমাণ অজ্ঞতা ও বোকামি!

যাই হোক, যেহেতু বায়োডাটা লিখনের ব্যাপারে কথা হচ্ছে তাই আরেকটা বিষয় বলা জরুরি। এমনও হতে পারে, আপনি চান না আপনার কোনো বিশেষ অভ্যাস বায়োডাটায় উল্লেখ থাকুক, কেউ জেনে ফেলুক, যাতে আপনি লজ্জিত হবেন। এর অর্থ হলো, আপনি নিজেই স্বীকৃতি দিচ্ছেন, আপনার সেই অভ্যাসটা 'বদভ্যাস'। এ সংক্রান্ত একটা হাদীস আছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'যেটা অন্যের সামনে প্রকাশিত হোক, লোকে জানুক, সেটা যখন তুমি চাও না, তখন সেটাই পাপ।' (মুসলিম, হাদীস নং- ৬৪১০)। তাই যদি এমন কোনো পাপ বা বদঅভ্যাস থেকে থাকে, যা উল্লেখ করার মতো নয়, তবে সেটা বিয়ের আগেই পরিহার করা উচিত। যেমন, ধুমপান কিংবা মাদকসেবনের মতো সমস্যা। উল্লেখ্য, আজকাল আধুনিক মেয়েদের কেউ কেউ অভিজাত রেস্টুরেন্টে সিসা কর্নারে নেশা করে। নিজের ভালোর জন্য, সুস্বাস্থ্যের জন্য এগুলো ত্যাগ করুন।

সবশেষে, যারা বিয়েটাকে শ্রেফ একটা সামাজিক রীতি মনে করে, তাদের কাছে জীবনের তাৎপর্য ফিকে। তবে যারা একটা সুন্দর ও পবিত্র জীবন অতিবাহিত করতে চায়, যারা জানে বিয়ে হয় জীবনকে শান্তি দিবে, সুন্দর লক্ষ্যের দিকে পৌঁছে দিবে, নয়তো লক্ষ্যচ্যুত করবে; তারাই বিয়ের আগে সচেতন হয়। তাদের বায়োডাটাই তাদের প্রতিচ্ছবি...।

www.pathagar.com

বিয়ের আগে সাক্ষাৎকার

বিয়ের আগে বিবাহেচ্ছুক পাত্র বা পাত্রীর একে অপরের সরাসরি সাক্ষাৎকার নেয়া উচিত। এতে অনেক বিষয় পরিষ্কার হয়। নিচে পর্যায়ক্রমে পাত্রী ও পাত্রের সাক্ষাৎকারের কিছু টিপস দেয়া হলো। উল্লেখ্য, সাক্ষাৎকারটি তৈরি করতে আমি Blissful Marriage বইটির সহায়তা নিয়েছি (ডা. একরাম বশির ও ড. এম. রিদা বশির মিলে বইটি লিখেছেন। আমেরিকার আমানাহ পাবলিকেশন্স থেকে এটি প্রকাশিত হয়েছে)। সেই সাথে এদেশের প্রেক্ষাপটে আমি কিছু যোজন-বিয়োজন করেছি।

শুরুতে নাম, পড়াশোনা ইত্যাদি প্রাথমিক আলাপ সেরে পরবর্তীতে প্রশ্ন করতে পারেন –

পাত্রীর ক্ষেত্রে

১। কেমন জীবনসঙ্গী পছন্দ করেন?

২। আপনি আপনার স্বামীর ক্যারিয়ার নিয়ে কেমন আকাঙ্ক্ষা করেন? চাকরি থাকলে চলবে, নাকি ব্যবসা? (মধ্যবিত্ত পরিবার হলে)

৩। ধরুন, আপনার মনে হচ্ছে, আপনি প্রাপ্য অধিকার আপনি পাচ্ছেন না। সেক্ষেত্রে কী করেন? মানে, আপনার প্রতিক্রিয়া কেমন হয়?

৪। অপর ব্যক্তি আপনার মতামত বুঝছে না বা সমর্থন করছে না। সেক্ষেত্রে কী করেন?

৫। অবসর সময়ে কী করেন?

৬। স্বামীর অধিকার বলতে কী বুঝেন?

৭। নামাজ পড়েন কিনা? পাঁচ ওয়াক্ত পড়া হয়?

৮। রাস্তায় আজান হয়ে গেলে কী করেন? ধরুন, বাসা বেশ দূরে।

৯। আপনি যেভাবে আমার সামনে এসেছেন, রাস্তায়ও কি এভাবে যান?

১০। ইসলামী বই পড়া হয়? তাফসীর-হাদীস?

১১। আচ্ছা, স্বামীর দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে, 'আমি বাইরের কাজ করি, তাই বাচ্চা সামলানো শুধু তোমার দায়িত্ব'। সেক্ষেত্রে আপনার কিছু বলার আছে?

www.pathagar.com

১২। অনেক স্বামীর রাগের সময় মাথা ঠিক থাকে না, ঘর মাথায় তুলে নেয়। তবে রাগ ঠাণ্ডা হলে সব ভুলে যায়। এমন ব্যক্তির ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কী?

১৩। (পাত্রী যদি বিভিন্ন সংগঠনের সাথে জড়িত থাকে) আপনি কি রোজই এসব নিয়ে ব্যস্ত থাকেন? নাকি সপ্তাহে দুয়েকদিন? কোনো রুটিন? স্বামী সারাদিন অফিসের কাজ করে বাসায় ফিরলো, সেক্ষেত্রেও কি আপনি সেইসব নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন?

১৪। বিয়ে বলতে কী বুঝেন?

১৫। রেগে গেলে ধ্বংসাত্মক কিছু করে বসেন না তো?

পাত্রের ক্ষেত্রে

১। কেমন জীবনসঙ্গী পছন্দ করেন?

২। অবসর সময়ে কী করেন?

৩। স্ত্রীর অধিকার বলতে কী বুঝেন?

৪। স্ত্রী বিভিন্ন সংগঠনের সাথে জড়িত, তাই মাঝেমধ্যে সেই কাজে বের হতে হয়। এক্ষেত্রে আপনার কেমন ভূমিকা থাকবে?

৫। স্বামীর আনুগত্য করা বলতে কী বুঝেন?

৬। নামাজ পড়েন কিনা, পাঁচ ওয়াক্ত পড়া হয়?

৭। রাস্তায় আজান হয়ে গেলে কী করেন? ধরুন, বাসা বেশ দূরে।

৮। ইসলামী বই পড়া হয়? তাফসীর-হাদীস?

৯। বিয়ে বলতে কী বুঝেন?

১০। ধরুন, আপনার মনে হচ্ছে, আপনি প্রাপ্য অধিকার আপনি পাচ্ছেন না। সেক্ষেত্রে কী করেন? মানে, আপনার প্রতিক্রিয়া কেমন হয়?

১১। অপর ব্যক্তি আপনার মতামত বুঝছে না বা সমর্থন করছে না। সেক্ষেত্রে কী করেন?

১২। আপনি কি নিজেকে পরিবারের কর্তা মনে করেন? মানে, পারিবারিক সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় কি শুধু আপনিই মতামত দেন, নাকি সম্মিলিতভাবে নেন?

১৩। ধরুন, আপনার বৃদ্ধ মা-বাবা আছে। আপনার স্ত্রীর বক্তব্য হলো, 'আপনার মা-বাবাকে দেখা আমার দায়িত্ব নয়।' তখন আপনার মতামত কী হবে?

www.pathagar.com

১৪। অনেক স্ত্রীর রাগের সময় মাথা ঠিক থাকে না, ঘর মাথায় তুলে নেয়। তবে রাগ ঠাণ্ডা হলে সব ভুলে যায়। এমন ব্যক্তির ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কী?

১৫। রেগে গেলে ধ্বংসাত্মক কিছু করে বসেন না তো?

জানি, সবার বলার, জানার আর লাইফ স্টাইল এক না হওয়ায়, উপরের অনেক প্রশ্ন কারো কাছে অমূলক মনে হতে পারে; আবার কিছু প্রশ্ন উপকারী মনে হতে পারে। তবে সব প্রশ্ন একেবারে মুখস্ত করে ধারাবাহিকভাবে গড়গড় করে বলে যেতে হবে, বিষয়টি তা নয়। আবার, কেউ কেউ বোকার মতো অপরপক্ষকে এমনভাবে প্রশ্নবানে জর্জরিত করে ফেলে যে, অপরপক্ষ ঘাবড়ে যায়। আশা করি, পরিস্থিতি আপনাদেরকে শিখিয়ে দেবে।

আপনার বৈবাহিক জীবন সুখী হোক।

www.pathagar.com

ঘটক যখন ডাকাত

বিবাহপ্রার্থীদের কাছ থেকেই শিরোনামের সত্যতা যাচাই হয়েছে। শুধু তাই নয়, ডাকাত তো জোরপূর্বক টাকা-সম্পদ আত্মসাৎ করে, কিন্তু ঘটকরা এখন ডাকাতের চেয়েও সাঙ্ঘাতিক! এরা মানুষের দুর্বলতা, আবেগ ও অসহায়ত্বকে পুঁজি করে, কখনো ভুলিয়ে বা ফুসলিয়ে, কোথাও বা জোর দাবি খাটিয়ে মোটা অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নেয়। অনেক পরিবারেই মা-বাবা নিরুপায় হয়ে দিয়ে যাচ্ছে। কোথাও বা ঘটকের খরচ চালাতে না পেরে অভিভাবকদের মধ্যেও সৃষ্টি হচ্ছে মনোমালিন্য। অন্যদিকে, বছরের পর বছর টাকা দিয়ে গেলেও ঘটকের দ্বারা কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না বলে অভিযোগও রয়েছে। এটা কি ঘটকদের চালাকি, নাকি এটাই এখন তাদের ধান্দা!

রাজধানী ঢাকায় উন্নত ডেকোরেশনে সজ্জিত অভিজাত ও বড় একটি ম্যারিজ মেকিং সংস্থা সরেজমিনে দেখে এসে একজন মুরুব্বির প্রতিক্রিয়া হলো, 'নিজের মেয়ের জন্য সেখানে খোঁজখবর নিতে গিয়ে প্রথমেই সন্দেহের মধ্যে পড়ে যাই। একটা ম্যারিজ কোম্পানির এতো হাইফাই স্ট্যাটাস কিভাবে? ভিতরে আর কী হয়?' এদিকে সংস্থাটির শর্ত হলো, 'বায়োডাটা জমা দেয়া মাত্র ৫ হাজার টাকা জমা দিতে হবে। আপনার দেয়া বায়োডাটার সাথে কারো বায়োডাটা মানানসই হলে পরে জানানো হবে।" এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এরা কি ভেবে দেখেছে বাংলাদেশের কয়টা পরিবারের শুরুতেই এতো টাকা দেয়ার সামর্থ্য আছে? তাছাড়া আজকাল অনলাইনে যেখানে অনেক কাজ হয়ে যাচ্ছে, সেখানে আসলেই কি এতো খরচ পড়ে?

যাই হোক, এবার কিছু সাইনবোর্ড ছাড়া লোকাল ঘটকের কথা বলি। এদের দাবি হলো, কাজ হাতে নেয়া মাত্র ৫'শ টাকা দিতে হবে। পরবর্তীতে যতবার বাসায় আসবে, ততবার ২'শ টাকা দিতে হবে। বিয়ে সম্পন্ন হওয়ার পর আরো ২০ হাজার টাকা দিতে হবে। অবশ্য টাকার এই পরিমাণ নির্দিষ্ট নয়, স্থানভেদে বিভিন্ন হয়। একজন ঘটক নিজেই জানালেন, "আমার ধানমন্ডি এলাকায় এক রেট, পুরান ঢাকার অলি-গলিতে আরেক রেট। কোনো বাড়িতে ঢুকে আমি এক হাজার টাকাও নিয়ে নিই।" তবে তাদের এরূপ যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে শিমু (ছদ্মনাম) নামে এক পাত্রী বলেন, "ঘটকের জ্বালা যন্ত্রনা অনেক। বাসায় আসলেই ৫'শ টাকা দিতে হয়। বার বার কি এতো টাকা দেয়া সম্ভব? এতো খরচের জন্য এসব থেকে একদম মন উঠে গেছে।"

www.pathagar.com

অপরদিকে, বার বার এতো টাকা দেয়ার পরও চলে ঘটকের প্রতারণা, অসমাপ্ত কাজ ও ধূর্ততা। দেখা যায়, একটি ফোন কলেই যা বলা সম্ভব, তা না করে ঘটক হুট করে বাসায় চলে আসে। উদ্দেশ্য হলো টাকা নেয়া। কখনোবা ফোন করার প্রয়োজন হলেও ফোন না দিয়ে মিসড কল দিতে থাকে। যাতে নিজের একটি টাকাও খরচ না হয়। তাহলে এতো টাকা দিয়ে তারা করছেটা কী?

সত্য কথা হলো, ঘটকের যন্ত্রণায় অধিকাংশ পরিবারের পাত্র-পাত্রী, অভিভাবক তথা সবাই অতিষ্ঠ, কিন্তু লোকলজ্জায় কেউ কিছু বলছেন না।

তাই ভালো ঘটক তারাই যারা ঘটকালিকে পেশা হিসাবে নয়, দায়িত্ব হিসাবে নিয়েছেন বা নিচ্ছেন। যারা নেক কাজের অংশীদার হিসাবে বিনামূল্যে এটি করছেন, তারা নৈতিকতা ও দায়িত্ববোধ নিয়েই কাজ করে থাকেন। তবে বাস্তবে এমন লোকের সংখ্যা খুব কম, হাতে গোনা। তবে হ্যাঁ, দুনিয়ার সবাই যে এক হবে, তাও নয়। আমি ব্যক্তিগতভাবে এক মহিলাকে চিনি যার স্বামী মারা গেছেন, সন্তানেরা নিজ খরচ নিজে চালায়। সেই মহিলা হাতখরচ বাবদ ঘটকালি করেন। সুতরাং, এই মহিলার পরিস্থিতি বিবেচনায় তাদেরকেই ভালো ঘটক বলা যায়, যারা মানুষের ওপর জুলুম না করে সামান্য টাকায় ঘটকালি করে ও বিয়ে হয়ে গেলে তাদের সামর্থ্য বুঝে সালামী নেয়।

www.pathagar.com

বিয়ে বন্ধ করে রেখেছে

বিষয়টা হাস্যকর। তবে আধুনিক যুগেও মানুষের কিছু ধ্যানধারণার পরিবর্তন হচ্ছে না। বিশেষ করে যাদুটোনার ক্ষেত্রে। আর এই বিশেষ ধারণাটা বিশেষভাবে জাগ্রত হয় যখন কারো মেয়ের বিয়ে হতে দেরি হয়। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মা-বাবা তখন দ্বারস্থ হন মাজার, কবিরাজ কিংবা জ্যোতিষীর কাছে। সবার জন্যই তাদের রেডিমেড ডায়ালগ, 'আপনার মেয়ের বিয়ে কেউ বন্ধ করে রেখেছে। সমাধান পেতে চাইলে কিছু হাদিয়া দিয়ে যান। আপনার মেয়ের বিছানা, চিরুনি, গোসলের পানি ও রুমের চারপাশে ছিটানোর জন্য পানি পড়া দিয়ে দেবো। এগুলো যথাস্থানে ছিটিয়ে দিবেন।' বিবাহযোগ্য একাধিক মেয়ের সাথে কথা বলে তাদের পরিবারের এমন তৎপরতার কথাই জানা গেলো।

লক্ষ্যণীয়, জ্যোতিষীরা সবার ক্ষেত্রে একই কথা বলে প্রতিবার হাজার হাজার টাকা কামাই করে নিচ্ছে। এর বিপরীতে যারা তাদের স্মরণাপন্ন হচ্ছেন তাদের মনে জ্যোতিষীর প্রতি, আগাম ভবিষ্যতবাণীর প্রতি একটা বিশ্বাস জন্মাচ্ছে এবং নিজের অজান্তেই আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস উঠে যাচ্ছে। অথচ আল্লাহ যে অদৃশ্যের মালিক এবং সবকিছুর নিয়ন্ত্রক, এসবের ওপর ঈমান কমে যাচ্ছে। আর ভরসা যখন আল্লাহ ব্যতীত সেই জ্যোতিষী ও তার অর্থ না-জানা মন্ত্রমিশ্রিত পানি ছিটানোর ওপর চলে যাচ্ছে, তখন শিরক তথা আল্লাহর একত্ববাদিতায় অংশিদারিত্ব হয়ে যাচ্ছে। ফলে কবিরা গুনাহ হয়ে যাচ্ছে! যদিও যারা এসবের স্মরণাপন্ন হন তারা মুখে বলেন, 'আমরা তো আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখি!'

অনেকে যাদুটোনার পক্ষে যুক্তি দিয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহর (সা) ওপরও তো যাদু করা হয়েছিলো। তাদেরকে বলবো, তিনি আল্লাহর আদেশে কী করেছিলেন, তা কি আমরা লক্ষ করি? তিনি সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস পড়েছিলেন। অথচ আমরা কয়জন এ ছোট সূরা দু'টির অর্থ জেনে বুঝে পড়ি? তাছাড়া রাতে ঘুমানোর সময় এই দুটি সূরা ও আয়াতুল কুরসী পড়ে ঘুমানো উত্তম। আমরা কয়জন অর্থ জেনে এসব আমল করি?

এবার যা না বললেই নয় তা হলো, জ্যোতিষীরা যা করে সেটা প্রকৃতই শয়তানের কাজ। কারণ, সহীহ মুসলিমের ৫৭১০ নং হাদীসে বলা আছে, কিছু লোক নবীজীকে জ্যোতিষীর কিছু আগাম কথা বাস্তব হয়ে যাওয়া প্রসঙ্গে জিজ্ঞাস করায় তিনি বলেন, "ঐ একটা কথা বাস্তব সত্যের অন্তর্ভুক্ত, যা জিনেরা চুরি করে নিয়ে আসে"। বিস্তারিত এসেছে ৫৭১২ নং হাদীসে। যেখানে বলা আছে এমন, আল্লাহ যখন কোনো বিষয়ের সমাধান দেন, তখন আশেপাশের ফেরেশতারা সেটা নিয়ে আলোচনা করে, সংবাদ আদান-প্রদান করে।

www.pathagar.com

পরিশেষে এ সংবাদ নিকটবর্তী আকাশে পৌঁছে। সে সময় জিনেরা লুকিয়ে গোপন বিষয় শুনে নেয় এবং এর সাথে অতিরিক্ত কিছু জুড়ে দেয়। তারপর তাদের দোসর জ্যোতিষীর নিকট তা পৌঁছে দেয়। তখন জ্যোতিষীরা বলতে পারে। আরেকটি হাদীসের বর্ণনায় এসেছে এমন "জিনেরা আংশিক সংবাদ শুনতে পায়, পুরোটা নয়। তাদের উপস্থিতি লক্ষ করে ফেরেশতারা তাদের তাড়িয়ে দেয়, যেটা আকাশ থেকে খসে পড়া তারকার মতো আমরা দেখে থাকি।"

মোদ্দাকথা হলো, জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে হওয়া, দেরিতে হওয়া কিংবা না হওয়া থেকে শুরু করে পৃথিবীর সবকিছুর নিয়ন্ত্রক আল্লাহ তায়ালা। আমরা শুধু ভালো পথে চেষ্টা করবো, বাকিটা ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিবো। আর বিশ্বাস রাখতে হবে তেমনই, যেমনটি আল্লাহ বলেছেন। কারণ, তিনি আমাদের জন্য যা নির্ধারণ করেছেন, কেউ তা থেকে আমাদের বঞ্চিত করতে পারবে না।

আল্লাহ যদি তোমাদের সাহায্য করেন তাহলে কোনো শক্তি তোমাদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করতে পারবে না। আর যদি তিনি তোমাদের পরিত্যাগ করেন, তাহলে এরপর কে আছে তোমাদের সাহায্য করার মতো? কাজেই সাচ্চা মুমিনদের আল্লাহর ওপরই ভরসা করা উচিত।" (সূরা ইমরান: ১৬০)

www.pathagar.com

দাড়ি রাখলে বিয়ে করা যায় না

অনেক ছেলের ধারণা (এমন ধারণার জন্য দায়ী মিডিয়া ও মেয়েরা), দাড়ি রাখলে বিয়ে করা মুশকিল। কারণ, দাড়িওয়ালা ছেলেদের মেয়েরা পছন্দ করে না। আবার এমনও দেখা যায়, ছেলে দাড়ি রাখতে চায়, তবে পরিবার থেকে তাকে নিরুৎসাহিত করা হয়। তাই রাখা হয় না। আবার কিছু ছেলে তো বর সাজতে গিয়ে দাড়ি কেটে ফেলে। পারিবারিক চাপ ও ফ্রেন্ডদের নিরুৎসাহিতার ফলে তাদের মনে ধারণা জন্মে যায়, দাড়ি থাকলে হয়ত সুন্দর লাগবে না, আনস্মার্ট লাগবে। যদিও ব্যাপারটা সেরকম নয়।

অবশ্য একটা কথা বলে রাখা সমীচীন মনে করি। তাহলো, দাড়ি রাখা উত্তম। তবে কোনো ছেলের দাড়ি দেখেই যে বিয়ে করতে হবে, এমন শর্ত অজ্ঞতার মধ্যে পড়ে। হ্যাঁ, যে মানুষটি অধিক তাকওয়াসম্পন্ন, তিনি দাড়ি রাখবেন। অনেকেই এমন আছেন, কোরআন-হাদীস সম্পর্কে যাদের অগাধ জ্ঞান, ইসলামকে মানবতার সমাধান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার তীব্র ইচ্ছাশক্তি ইত্যাদি সবই আছে, কিন্তু কোনো এক মানসিক দুর্বলতার কারণে দাড়ি রাখা হচ্ছে না। তবে কি সেই মানুষকে আপনি খারাপ বলবেন?

এবার আমি একটা প্রত্যক্ষ উদাহরণ দেই। ঘটনাটা পাসপোর্ট অফিসের। বলে রাখি, পাসপোর্ট নেয়ার সময় নারী-পুরুষের আলাদা লাইন থাকে। কোনো তাড়াহুড়া বা ধাক্কাধাক্কির সম্ভাবনা থাকে না। তাছাড়া সকলের সুবিধার্থে মাইকে নাম ধরে ডাকা হয়। ঘটনার দিন মহিলাদের লাইনের সামনে মহিলারা জড়ো হয়ে বসেছিলেন। কেউ কেউ দাঁড়িয়েছিলেন। হঠাৎ এক দাড়িওয়ালা পুরুষ (বয়স আনুমানিক ৩৫) এসে দাঁড়িয়ে থাকা দুজন মহিলার পেছনে দাঁড়ালেন। এতে মহিলারা অস্বস্তিবোধ করছিলেন। এক পর্যায়ে তারা বলেই ফেললেন, "ভাই! আপনি এখানে এসে দাঁড়ালেন কেনো? পুরুষদের লাইনে যান।" তখন লোকটি বেশ রূঢ় কণ্ঠে জবাব দিলেন, "এখানে আমার বউ আছে, তাকে দেখিয়ে দিতে হবে। আপনার সমস্যা হলে আপনি সরে যান।" মহিলা দুটি আর কিছু বললেন না।

অথচ লোকটার এমনভাবে কথা বলা ঠিক হয়নি। মহিলারা আর কোথায় যাবেন? তিনিই তো বরং মহিলাদের জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন। আর রইলো ভদ্রলোকের বউয়ের কথা। আসলে পাসপোর্ট নেয়ার সময় এমন কিছু করতে হয় না, যা বউকে দেখিয়ে দিতে হবে। শুধু স্বাক্ষর করে নিজের পাসপোর্ট নিয়ে আসতে হয়। এখানে দেখিয়ে দেয়ার কী হলো? কোথায় স্বাক্ষর করা লাগে, তাও তো সেনাকর্মকর্তারা দেখিয়ে দেন। তাই উনার এমন আচরণ দেখে খারাপ লাগলো। ধর্মীয় লেবাস ধারণ করে তিনি যে অভদ্রতা করেছেন, এতে

www.pathagar.com

ধর্মবিদ্বেষীরা ধর্মের বিরুদ্ধে বিশেষত ইসলামের বিরুদ্ধাচারণ করার সাহস পাবে – এমনটা ভেবে আরো বেশি খারাপ লাগলো। আমি বলছি না, সব দাড়িওয়ালা এমন। আমি জাস্ট বিপরীত একটি উদাহরণ দিলাম। মূলত, দাড়ি হচ্ছে ছেলেদের পরহেজগারির প্রতীক। এটা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা তথা গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত। যদিও অনেক আলেম দাড়ি রাখাকে ফরজ বা ওয়াজিব বলে মত দেন। যাই হোক, তবে এটা আমরা সবাই জানি, রাসূলুল্লাহ (সা) গোফ ছোট করতে, আর দাড়ি রাখতে বলেছেন। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবেসে দাড়ি রাখে, তাদের ক্ষেত্রে কোনো কিছুই প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় না।

একবার এক আন্টি এলাকার এক ছেলের প্রসঙ্গ তুলে আমুকে বললো, "ছেলেটাকে তার পরিবার বলছে, আমিও বলছি, দাড়িটা ফেলে দাও। কিন্তু না, কোন হুজুরের কাছ থেকে শুনেছে, তারপর থেকে দাড়ি রাখা শুরু করেছে। দাড়ির কথা বললেই বলে, "না, ফেলবো না।" দাড়ি রাখা নিয়ে সেই ছেলেটা কি পরিমাণ সংগ্রাম করছে, তা তো বুঝাই গেলো।

আবার এটা সত্য, অনেক মেয়ে দাড়িওয়ালা ছেলে পছন্দ করে না। দাড়ি রাখলে নাকি 'বুড়া বুড়া লাগে'! এটা মূলত দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার। আমি মনে করি, এ ধরনের মানসিকতার পরিবর্তন জরুরী। উদাহরণস্বরূপ, কেউ হিজাবী মেয়ে পছন্দ করে, কেউবা হিজাব ছাড়া পছন্দ করে। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, 'স্বাভাবিকভাবে চললেই তো হয়, এতো গোঁড়ামি করার কী আছে?' অর্থাৎ তাদের কাছে হিজাব করা গোঁড়ামি পর্যায়ের ব্যাপার! সুতরাং এগুলো হচ্ছে একেক জনের দৃষ্টিভঙ্গি।

যারা বলেন 'বুড়া বুড়া লাগে' তাদেরকে বলি, ছেলে হোক মেয়ে হোক, বয়সের ছাপ মানুষের মুখের ওপর পড়বেই সে ক্ষেত্রে ছেলেদের মুখে দাড়ি থাকুক বা না থাকুক। তাছাড়া একজন মানুষের মানসিকতা, কথা বলার ধরণ, চলাফেরা, স্মার্টনেস ইত্যাদি দ্বারা মানুষটি বয়স্ক নাকি যুবক, সেটাও বুঝা যায়। আর কেউ যদি বলে 'দাড়ি রাখলে আনস্মার্ট লাগে', তাহলে বলবো, আগোছালো সব কিছুই আনস্মার্ট। পরিপাটিভাবে থাকলে সবকিছুই স্মার্ট।

যাই হোক, আমি কারো ভালোলাগার ওপর হস্তক্ষেপ করতে চাই না। তবে সমাজে একটি ধারণা বেশ প্রচলিত। তাহলো, দাড়ি রাখলে বিয়ে করা মুশকিল। এই ধারণার বশীভূত হয়ে মেয়েদের সামনে স্মার্ট লাগবে ভেবে অনেকে দাড়ি রাখেন না। দাড়ি রাখার গুরুত্বের ব্যাপারে জানলেও মানসিক দুর্বলতার জন্য রাখা হয় না বা বিয়ের আগে ক্লিন সেইভ করে ফেলেন। আবার অনেককে দেখা যায়, বিয়ের আগে দাড়ি থাকলেও বিয়ের পরে ক্লিনশেভড হয়ে যান। তখন লোকেরা হেসে হেসে বলে, "কি রে! বউ এসে দাড়ি কাটিয়ে ফেললো নাকি! হে হে...।" বউ এসে যদি এমনটি করে বা ছেলেটি বর সাজতে গিয়ে যদি এমন করে বসে, তাহলে তো বলবো, একটি জঘন্য কাজ তারা আনন্দের সাথেই করলো!

আমার এক ফ্রেন্ডের কথা দিয়েই লেখাটি শেষ করছি। কথা প্রসঙ্গে সে একদিন বললো, "ছেলেদের দাড়ি থাকাটাই ভালো লাগে। দাড়ি রাসূলুল্লাহ (সা) পছন্দ করেন তথা আল্লাহ ভালোবাসেন। আর আল্লাহ যেটা ভালোবাসেন সেটাই আমি ভালোবাসি।"

www.pathagar.com

ইতি, আপনার একান্ত অনুগত...

শ্রদ্ধেয় আব্বু-আম্মু,

আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সুস্থ-সবল আছেন এটাই আমার সন্তুষ্টি ও কামনা। ছোটবেলা থেকেই আপনারা শিখিয়েছেন এবং বিদ্যালয়েও শিখেছি, "পৃথিবীতে সবচেয়ে আপনজন মা-বাবা।" তাই আপনারা আমাদের অনুভূতি বুঝবেন এটাই কামনা করি। আপনাদের যে বিষয়গুলো অতিরিক্ত, অযৌক্তিক ও জুলুম বলে মনে হয়- সেটা নিয়ে সবসময় সামনাসামনি বলার সুযোগ না হওয়ায় আজ কলমের আশ্রয় নিয়েছি।

বেশ কিছু দিন আগে ভাইয়া আপনাদেরকে একটা মেয়ের বায়োডাটা দেখিয়েছে। কিন্তু আম্মু, আপনি সেই মেয়েটাকে পছন্দ করেননি। কারণ কী ছিলো? বলেছেন, "ধুর! মেয়ে তো বেঁটে। মাত্র ৫ ফিট! আর রঙ শ্যামলা। নাহ! আমার পছন্দ হয়নি।" অথচ ভাইয়ার গায়ের রঙও কিন্তু শ্যামলা। যাই হোক, আপনারা কেউই সেই মেয়ের সাথে একটু কথাও বলে দেখলেন না যে, তার ধ্যান-ধারণা, জ্ঞান, মানসিকতা, নৈতিকতা কেমন। সেই অনুযায়ী ভাইয়ার সাথে ম্যাচ হবে কিনা।

বলছেন, ৫ ফিট উচ্চতার কথা। অথচ আম্মু, আমরাই তো ৫ ফিট! তাহলে আজ আপনি নিজের ঘরে না তাকিয়ে অন্য মেয়েকে সেই শব্দটি ছুঁড়ে দিলেন! একই কথা আপনার মেয়েকে কেউ বললে আপনি নিজেই তা পছন্দ করবেন না। আরেকটা বিষয়, ৫ ফিটকে কি বেঁটে বলা যায়? যেখানে বাংলাদেশের অধিকাংশ মেয়েরাই তো ৫ ফিট হতে ৫ ফিট ৩/৪ ইঞ্চের মধ্যে? তাই না?

এবার আসি দ্বিতীয় প্রসঙ্গে। আম্মু, আপনি বলেছেন, 'মেয়ে তো শ্যামলা'। আম্মু, ছোটবেলায় আপনি আমাদের শিক্ষণীয় যেসব গল্প শোনাতেন, তা কি আপনি ভুলে গেছেন? সেসব গল্পে মূলবার্তা থাকতো, মানুষ তার গুণ আর সৎ চরিত্রের মাধ্যমেই সমাজে প্রতিষ্ঠিত ও পরকালে মুক্তি পেতে পারে। অথচ আজ আপনি নিজেই একজন মানুষকে শুধু উপরি রঙ দেখে বিচার করছেন? আচ্ছা আম্মু, আপনি কি ফর্সা? আমরা কি ফর্সা? তো, আপনি একটা মেয়েকে শুধু ফর্সা না হওয়ার কারণে বাদ দিচ্ছেন কেন? তাহলে তো কাল হয়ত কেউ আমাকে শুধুমাত্র ফর্সা না হওয়ার কারণেই বাদ দিবে! তখন তা কি আপনার ভালো লাগবে? নিশ্চয়ই না।

www.pathagar.com

কী অবাক বিষয়, তাই না আম্মু! বলা হয়, নারী নাকি নারীর দুঃখ বুঝে। আসলেই কি তাই? আজকাল 'ফর্সা চাই, ফর্সা চাই' করতে করতে নারীদের পুঁজিবাদের বেড়াজালে আটকানো হচ্ছে। অতিরিক্ত প্রসাধনীর ব্যবহার, রঙ ফর্সা করার ক্ষতিকারক সীসাযুক্ত ক্রিমের ব্যবহার, অতিরিক্ত পার্লারে যাওয়া, এর পেছনেই সময়, টাকা ও শ্রম ব্যয় করা, কতো যে ঘষামাজা চলছে...তার কোনো সীমা পরিসীমা নেই। আফসোস লাগে, এইরূপ ঘষামাজা যদি মনটাকে সুন্দর করার জন্য করা হতো!

আম্মু, অপরূপ সুন্দরী বউ এনে কি হচ্ছে? দেখা যাচ্ছে, শাশুড়ি সবার সামনে যে বউয়ের রূপের বর্ণনা করে 'আমার বউ' বলে গর্ব করতেন, সেই কিনা পরিবারের বড়দের অসম্মান করছে। তাহলে আম্মু, অবশেষে হচ্ছেটা কী?

আব্বু, আপনাকেও একটু বলতে চাই। ছোট মুখে বড় কথা, তাও বলি। জামাই পছন্দ করতে গিয়ে আপনি এমনসব শর্ত জুড়ে বসে আছেন, যেগুলো আপনার মধ্যে অর্থাৎ, আপনি যখন আম্মুকে বিয়ে করেছিলেন তখনও ছিলো না। আপনি চান ছেলের নিজস্ব বাড়ি কিংবা আলাদা ফ্ল্যাট বা বাবার সম্পত্তি থেকে ভাগ করা আলাদা জমি থাকুক। বাড়ির সাথে গাড়ি থাকলে তো আরো ভালো। উপার্জনও সেইরকম হোক। ধনী পরিবারের ধনাঢ্য ছেলে! সেই সাথে ছেলের বয়সও যাতে বেশি না হয়। দেখতেও যেন নায়কের মতো লাগে!

আব্বু, সমাজের মানুষ কী কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়ে পড়েছে? একটা মানুষের বয়স কতো হলে টাকা জমিয়ে নিজের একটা স্থায়ী ঠিকানা, আলাদা ফ্ল্যাট করতে পারে? আমি তো জানি, পৃথিবীতে হালাল উপার্জন করা অনেক কষ্টসাধ্য ব্যাপার। আর তাই তো একটা স্থায়ী ঠিকানা করতে আপনাকেও তারুণ্য থেকে প্রৌঢ়ত্বে উপনিত হতে হলো। তাহলে আব্বু, আপনি কি ৪০/৫০ বছরের বয়স্ক কোনো ছেলের কাছে মেয়েকে বিয়ে দিতে চান? আপনি নিশ্চয় তা চান না। তাহলে আপনি কম বয়সী ছেলেও চাচ্ছেন, আবার বাড়ি-গাড়ি-উচ্চ বেতনও চাচ্ছেন; এটা কি অযৌক্তিক নয়? এমনকি আপনি যখন আম্মুকে বিয়ে করেছিলেন, তখন তো একটা মুদি দোকান আর সামান্য চাকরি ছাড়া আর কিছুই আপনার ছিলো না। যা হলো সব বিয়ের পরে। তাহলে?

আব্বু, যেখানে 'স্বামীর উপার্জনে সুখী থেকো' বলে মেয়েকে আপনার নসিহত করার কথা, সেখানে আপনি সুখের সংজ্ঞা ধরে নিয়েছেন অঢেল টাকা, যার কোনা সীমা নেই। ছেলের অঢেল টাকা থাকলে আদৌ কি আপনার মেয়ে সুখী হবে, যদি ছেলেটার মানসিকতাই ভালো না হয়? ধর্মীয় জ্ঞান তথা নৈতিকতাই যদি না থাকে?

তাছাড়া আপনি চাইছেন, দেখতে হ্যান্ডসাম, হিরো, মডেলের মতো ছেলে। আব্বু, সে রকম ছেলের পেছনে যে কতো মেয়ে ঘুরে, আর কতজনকে সে ঘুরায়, তার কোনো হিসাব না হয় নাই বা দিলাম। আপনি নিজেই হয়তো ভালো অবগত আছেন। কারণ আপনি অভিজ্ঞ। তবে জানেন আব্বু! আজকাল ছেলেদের এরূপ উপরি হাবভাব দেখে বিবেচনা করা হচ্ছে বলেই

www.pathagar.com

নিত্যনতুন ম্যান'স ফেয়ারনেস ক্রিম, ফেসওয়াশ বের হচ্ছে। আর এসব ব্যবহারকারী পুরুষদেরকেই বিজ্ঞাপনে 'অ্যাকটিভ' বলে প্রচার করা হচ্ছে। অথচ 'অ্যাকটিভনেস' তো উপরের রূপ থেকে নয়, বরং শারীরিক শক্তি ও মনের বল থেকে আসে।

এতোদিন সাজসজ্জা শুধু নারীদের ব্যাপার হিসেবেই বিবেচিত হতো, আজকাল তা পুরুষদের ক্ষেত্রেও বিবেচিত হচ্ছে। দিন দিন ম্যান'স বিউটি পার্লারের সংখ্যাও বাড়ছে। শুধু তাই নয়, 'আমেরিকান সোসাইটি ফর অ্যাসথেটিক প্লাস্টিক সার্জারি'র ২০১৪ সালের এক জরিপে দেখা গেছে, শুধু ২০১৩ সালেই বিশ্বে প্রায় ১০ লাখ পুরুষ নিজের দৈহিক সৌন্দর্য বাড়াতে প্রসাধনী সামগ্রীর পেছনে ছুটেছে। ১৯৯৭ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত ছেলেদের মধ্যে সার্জারী করে দৈহিক সৌন্দর্য বাড়ানোর প্রবণতা বেড়েছে ৫০ শতাংশ। যুবসমাজকে এ পথে ঠেলে দেয়ার জন্য দায়ী তাহলে কারা?

জানি না, এতো বড় চিঠি পড়ার ধৈর্য আপনাদের হচ্ছে কিনা। বেয়াদবি হলে ক্ষমা চাচ্ছি। তবে আমি মনে করি, আপনাদের এরূপ মানসিকতা সুষ্ঠু সমাজ গঠনের পথে প্রতিবন্ধক। এটা কি সত্য নয়, যেখানে জ্ঞানের কদর হয় না, সেখানে জ্ঞানী (হোক ছেলে বা মেয়ে) জন্মায় না? তাই আরো কতো দশক পরে আমাদের সমাজে জ্ঞানের কদর হবে, সমাজ সুষ্ঠুভাবে পরিবর্তিত হবে জানি না। তবে আল্লাহর কাছে দোয়া করি, পরবর্তীতে আমি আমার সন্তানের জীবনসঙ্গী বাছাই করতে গিয়ে যেন এরূপ না করি।

ইতি
আপনার একান্ত অনুগত
আদরের মেয়ে

www.pathagar.com

টাকার মোহে মা-বাবাও অন্ধ

এবার মেয়ের বিয়ে দিতেই হবে। মা-বাবা সিদ্ধান্তে অটল। বর পছন্দের দিক দিয়ে মেয়ের মা-বাবার শর্ত তেমনই, যেমনটা অধিকাংশ মা-বাবার হয়ে থাকে। ছেলের কামাই ভালো হতে হবে। স্থায়ী ঠিকানা থাকতে হবে। বাবার উত্তরাধিকার থেকে নিজের আলাদা ফ্ল্যাট থাকলে আরো ভালো। দেখতে লম্বা-চাওড়া- হ্যান্ডসাম হতে হবে। আর বংশের মান-মর্যাদা উঁচু হলে তো কথাই নাই।

তেমনই এক প্রস্তাব এসেছে বাবার কাছে। স্ত্রীকেও জানালেন। মা-বাবা বড্ড খুশি! তারা যেমনটি চাচ্ছিলেন, তেমন ছেলেই পাওয়া গেছে। এবার মেয়েকে জিজ্ঞাসার পালা।

বাবা: (বায়োডাটা মেয়েকে দেখিয়ে) কি? কেমন লাগলো?

মেয়ে: হুম, ভালোই। তবে বায়োডাটা দেখে তো কিছু বলা যায় না। আচ্ছা, ছেলেটা ধার্মিক? নামাজ-তাফসির-হাদীস পড়ে তো?

মা: তোমার ওসব এখন রাখো!

বাবা: ছেলেকে তো আমি দেখেছি। হ্যান্ডসাম, সুন্দর, নিজের বাড়ি নিজেই ডিজাইন করে বানিয়েছে। কি যে সুন্দর! শুনলাম, বিয়ের পরে আলাদা ফ্ল্যাটে বউ নিয়ে থাকবে। সেখানে বিয়ে হলে অনেক আরামে থাকবা...।

মেয়ে: হ্যাঁ, ঠিক আছে। তবে আমি তো একটা শর্তই দিয়েছি। ছেলেটা তেমন কিনা, তার মানসিকতা...।

বাবা: আচ্ছা, তুমি যখন বলছো, তাহলে কালই এলাকার মসজিদে একবার খোঁজ নিবো।

(খবর নেয়ার পর আবার মা-বাবা-মেয়ে একসাথে)

বাবা: খবর নিয়েছি। দেখো মেয়ে! সবাই কিন্তু পৃথিবীতে এক রকম হয় না। অনেকে আগে এক রকম থাকে, পরে ঠিক হয়ে যায়। আমার কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শোনো। আমি তোমার বাবা। আমি তোমার জন্য ভালোটাই চাইবো, খারাপ নয়। যাই হোক, ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞাস করায় তিনি বলেছেন, ছেলেটাকে নাকি কখনো মসজিদেই দেখেননি। শুক্রবারেও না...।

মেয়ে: ব্যাস! কথা এখানেই শেষ। রিজেক্ট।

www.pathagar.com

মা: এভাবে রিজেক্ট করে নাকি মানুষ? দেখলো না, কিছু না...।

মেয়ে: আর দেখার কি দরকার? ছেলে যেখানে নামাজই পড়ে না, সেখানে কোরআন-হাদীসের প্রসঙ্গ না হয় আর তুললামই না।

মা: দেখো, সবাই তরুণ বয়সে ওরকম একটু থাকেই। পরে ভালো হয়ে যায়।

মেয়ে: যে তরুণ বয়সে ভালো হতে পারলো না, সে পরে ভালো হয়ে যাবে, তার কী ভারসা?

বাবা: আচ্ছা, ছেলে নামাজ পড়ে না, ঠিক আছে। বিয়ের পরে তুমি তাকে ঠিক করে নিও। পারবে না?

মেয়ে: আমি সেরকম খারাপ ছেলেকে ভালো করার নিয়ত নিয়ে বিয়ে করতে চাই না। ওসব নাটকে দেখা যায়। বাস্তবতা তেমন নয়। এমনও দেখা গেছে, বউ ভালো একটা কথা বললো আর স্বামী হটকারিতাবশত নিজের ভুলের উপরই টিকে থাকার জিদ ধরে আছে। বাস্তবতা অনেক কঠিন, আলাদীনের চেরাগের মতো এতো সহজ নয় যে বললাম আর ঠিক হয়ে যাবে। জানি, সমাজে এমন ধারণা প্রচলিত। নিজের খারাপ ছেলেকে একটা ভালো মেয়ের কাছে বিয়ে দিয়ে খোদ ছেলের মা-বাবা বউয়ের ওপর দায়িত্ব দিয়ে বলে, বউ সবকিছু ঠিক করে ফেলবে। অথচ পরে দেখা যায়, অত্যাচার আর নির্যাতনের শিকার হতে হয় সেই বউকেই।

মা: আচ্ছা, তুমি এতো খারাপ খারাপ কথা বলছো কি অর্থে? ছেলেটা কি চোর, গুণ্ডা, নেশাখোর?

মেয়ে: যদি সেরকম হয়, তো?

মা: বিয়ের পরে সেরকম দেখলে তালাক নিয়ে চলে আসবি।

মেয়ে: কি? তালাক? এটা কি কোনো খেলা নাকি? আর তালাক হলে আমার কী হবে? সবাই আমাকে বলবে, তালাকপ্রাপ্ত নারী! আর আমাদের সমাজে তালাকের ঘটনায় স্ত্রীর দোষ আছে নাকি স্বামীর, সেটা দেখা হয় না। তালাকপ্রাপ্ত মহিলাদের সহজে কেউ বিয়ে করতে চায় না। হোক আগের বিয়ের স্থায়িত্ব মাত্র এক রাত। কিছু না হলেও লোকে অন্য চোখে দেখে।

(এবার সবাই চুপ)

টাকার মোহ মানুষকে অন্ধ করে দেয়। অন্ধ করে দেয় বিয়ের আগে মেয়ের মা-বাবাকেও। তারা মনে করে আমার মেয়ে অনেক ভালো থাকবে। কিন্তু সেই টাকাওয়ালা ছেলের মানসিকতা যদি থাকে উগ্র কিংবা অনৈতিক, তাহলে বিয়ের পরে আফসোস করেও কিছু হয় না।

www.pathagar.com

উপরের কেস স্ট্যাডির শেষ কিন্তু হয়নি। কয়েকমাস আগে সেই ছেলেটার ব্যাপারে জানা গেছে। ছেলেটার বিয়ে হয়েছে অন্য একটা মেয়ের সাথে। তবে ছেলে নাকি এতোই ঝগড়াটে আর বেয়াদব যে, সম্পত্তি নিয়ে নিজের বাবার সাথেই ঝগড়াঝাটি করে। হয়ত ছেলেটি এখন আলাদা থাকে। অথচ ছেলের বাবাই নিজের একমাত্র ছেলের জন্য একসময় এলাকায় গর্ব করে বেড়াতেন...!

www.pathagar.com

অল্প বয়সে বিয়ে: সমস্যা কোথায়?

শিরোনাম দেখে অনেকেই হয়ত একপেশে মনোভাব পোষণ করছেন। তবে আমি চেষ্টা করেছি উভয়পাশ বিবেচনা করার। আচ্ছা, বিয়ের ক্ষেত্রে অল্প বয়স বলতে আমাদের সমাজে কি বুঝানো হয়? একটা ছেলের বয়স ২৩ বছর হলেও মা-বাবা তাকে 'বাচ্চা ছেলে' বলে। এমনকি ২৭/২৮ বছর হয়ে গেলেও ঐ একই কথা। হ্যাঁ, মা-বাবার নজরে তার সন্তানরা সবসময় ছোটই থাকে। আবার সরকারের নজরে তো ১৮ বছরের একটা মানুষও শিশু (২০১৩ সালের শিশু আইনের আলোকে)!

অন্যদিকে, ১৫-১৬ বছরের ছেলে-মেয়েদের প্রেমের সম্পর্কের ব্যাপারটা এখন প্রায় স্বাভাবিক ব্যাপার। অথচ ওই একই বয়সে বিয়ে হয়ে গেলেই যেনো তোলপাড়! এই তোলপাড়টা যেমন রাষ্ট্রীয়ভাবে, তেমনি সামাজিকভাবেও। আসলে, বিয়ের ক্ষেত্রে এই অল্প বয়সের মানদণ্ড কতটুকু সঠিক? বর্তমান অতিসংবেদনশীল প্রেক্ষাপটে এ ধরনের স্ববিরোধী মানসিকতা কি সুস্থ, নাকি অসুস্থতার লক্ষণ? এটাই মূলত এই লেখার আলোচ্য বিষয়।

প্রথম কিংবা দ্বিতীয় বর্ষে পড়ুয়া একটা ছেলের বয়স যদি ধরে নেই ২২ বছর (যদিও সেশনজটের কবলে পড়ে বয়স বাড়তেই থাকে)। এ বয়সের একটা ছেলের বিয়ের ক্ষেত্রে মা-বাবারা সাধারণত বলেন, "এখন বিয়ে হয়ে গেলে ছেলেটা পড়াশোনা করতে পারবে না।" কারণ হিসাবে বিয়েকে ঝামেলাস্বরূপ, অর্থাৎ, স্ত্রীকেই দায়ী করা হয়। তাই প্রশ্ন হলো, সেই পড়ুয়া ছেলেটাই যখন আরেক পড়ুয়া মেয়ের সাথে ক্যাম্পাসে ঘুরে, তখন কি তাদের পড়াশোনার ক্ষতি হয় না? কথাটা বলছি সেইসব ছেলেমেয়েদের ব্যাপারে, যারা পড়াশোনা করতে এসে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেমে পড়ে যায়। বিয়ের আগে যে কাজটি করা হয় সেটা বিয়ের পরে হলে সমস্যা কোথায়?

আসলে, সমাজের চাপিয়ে দেয়া রীতি-রেওয়াজ ও প্রচলিত বিভিন্ন কুপ্রথা বিয়েকে ঝামেলা ও উটকো দায়িত্বের মোড়কে আবদ্ধ করে কঠিন বানিয়ে ফেলেছে। বাস্তবতা হলো বিয়ের আগেই অনেক ছেলে-মেয়ের মন কলুষিত হয়ে যাচ্ছে। এ জন্য ছেলে-মেয়েদের দায়ী করা হলেও মা-বাবারাও দায়বদ্ধতা এড়াতে পারেন না।

প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনা শেষ হওয়া পর্যন্ত না হয় ছেলের বিয়ে স্থগিত রাখা হলো। কিন্তু বাস্তবতা হলো, পড়াশোনা শেষ হওয়ার পর যুক্তি দেয়া হয়, 'একটা চাকরি পেয়ে নিক, তারপর না হয় বিয়ে হবে'। চাকরি পাওয়ার পর বলা হয়, 'বিয়ের পরে প্রচুর খরচ, টাকা

www.pathagar.com

জমুক। তারপর দেখছি...'। এভাবে পরিবারের অহেতুক দেরী করার পেছনে যুক্তির শেষ নেই। অভিভাবকরা শুধু মানুষের 'মুখ আর পেটের' চিন্তায় মগ্ন। একটা মানুষের মুখ তো একটাই, নাকি? মানুষ কতটুকুইবা খায়? অথচ দেখা যায়, অনেক পরিবারের অবস্থা সচ্ছল। বাবার খরচেই ছেলে-মেয়েরা পড়াশোনা করছে। সেই পরিবারে আরেকটি মানুষ আসলে যে তাদের আর্থিক কষ্ট হবে তাও না। তবুও তারা ছেলেটার বিয়ে দিতে চান না (ছেলের কোনো সমস্যা না থাকলেও)।

বিপরীতদিকে, মেয়েপক্ষও 'ছেলের নিজস্ব কিছু হতে হবে, বাপের থাকলে চলবে না' জাতীয় শর্ত দিয়ে রাখেন। যদিও একটা ছেলের নিজের কিছু হতে অনেক সময় লাগে, সেই সাথে বয়সও বাড়তে থাকে। মেয়ের জন্যে অল্পবয়সী ছেলে চাওয়া হবে, আবার ছেলের নিজস্ব কিছু থাকাও লাগবে - এ দুটো শর্ত তো একসাথে হতে পারে না। সুতরাং, বলাই যায়, মা-বাবাদের এসব মানসিক সমস্যার কারণে সমাজে বিশৃঙ্খলতা ছড়াচ্ছে।

বাস্তবে দেখেছি, সারাদিন মোটর সাইকেল নিয়ে বসে থাকা ২৩ বছরের বেকার ছেলেটাকে যখন তার বাবা নিজ উদ্যোগে বিয়ে দিয়ে দিলো, তখন আপনা থেকেই তার রাস্তায় অহেতুক বসে থাকার বদঅভ্যাস চলে গেলো। উপরন্তু, দায়িত্বশীল মানসিকতা তৈরি হওয়ায় বাবার সাথে ব্যবসায়ও নেমে পড়লো। তাই মনে করি, ছেলেদের বিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে পরিবারের অহেতুক ধ্যানধারণা পরিহার করা দরকার।

সাংসারিক বিষয়ে অল্প বয়সের অনেক ছেলের মধ্যে অপরিপক্কতা থাকলেও পরিবারের সাথে থাকায় তা কাটিয়ে ওঠা যায়। তবে মেয়েদের অবস্থানটা এসব ক্ষেত্রে বেশ জটিল। তাই বিদ্যমান বাস্তবতাকে আমি তিনটি ধাপে আলোচনা করেছি:

১। অনেক পরিবার ছেলের জন্য কমবয়সী পাত্রী খুঁজেন। ভালো কথা, খুঁজতেই পারেন। যদিও ছেলের বয়স কিন্তু কম নয়। আপত্তিটা সেখানেই। ফলে স্ত্রীর সাথে স্বামীর ধ্যানধারণার বিস্তর ফারাক থাকে। আবার মেয়েটি যদি হয় বড় বউ সেক্ষেত্রে স্বামীর পরিবারের মানসিকতা হয় – "এখনো কি তুমি ছোট নাকি? তুমি এখন এই বাড়ির বড় বউ।" অতএব, দেখা যায়, বড় বউ হিসাবে তার দায়িত্বও তেমন বেশি। তাছাড়া স্বামীর দ্রুত বার্ধক্যে পদার্পণ ও তার খেদমত করা তো থাকেই। হ্যাঁ, ব্যতিক্রমও রয়েছে। কিছু পুরুষ অধিক বয়সে বিয়ে করলেও স্ত্রীর অধিকারের ব্যাপারে সচেতন থাকেন, আবার অল্পবয়সী স্ত্রীও সাংসারিক বিষয়ে অভিজ্ঞ হয়ে উঠেন।

তবে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বয়সের অধিক ব্যবধানের সমস্যাটা ছেলে বা মেয়ে – কোনো পক্ষই বিয়ের আগে বুঝতে চায় না। আমি এক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সা) ও উম্মুল মুমিনীন আয়েশার (রা) উদাহরণ তুলতে চাই না। কারণ, তাঁদের ব্যাপারটা আল্লাহর ইচ্ছায় হয়ে ছিলো। তাছাড়া বয়সের ব্যবধান থাকায় নবীজি (সা) বিবি আয়িশার (রা) সাথে তাঁর বয়সী আচরণই করেছিলেন। আমাদের ভাইদের মধ্যে কয়জন তা করেন? আপনাদের চেয়ে অনেক কম

www.pathagar.com

বয়সী মেয়ের প্রতি তাদের বয়স অনুযায়ী যথাযথ আচরণ করতে না পারলে কেনো আপনারা মা-বাবার কথায় 'কবুল' বলেন?

আরেকটা বিষয় লক্ষ্যণীয়। ছেলে-মেয়ের বয়সের কম ব্যবধানে আনন্দময় দাম্পত্য জীবনের প্রয়োজনীয়তার দৃষ্টান্ত আমরা সুন্নাহ থেকেও পাই। একবার এক যুবক এক বিধবা নারীকে বিয়ে করার পর রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে বললেন, "তুমি কোনো কুমারী মেয়েকে বিয়ে করলে না কেনো? তাহলে তুমি তাকে নিয়ে আনন্দ করতে, হাসিখুশিতে তোমার মন ভরে যেতো। আর সেও আনন্দ ও সুখ লাভ করতো"। তাছাড়া রাসূলুল্লাহর (সা) মেয়ে হযরত ফাতিমাকে (রা) হযরত আবু বকর (রা) ও হযরত ওমর (রা) বিয়ে করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে নবীজী উভয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তাঁদেরকে বলেছিলেন, তোমাদের দুজনের বয়সের তুলনায় সে অতি অল্প বয়সী মেয়ে। অন্যদিকে, যুবক আলীর (রা) সাথে তিনি নিজে উদ্যোগী হয়ে ফাতিমার (রা) বিয়ে দিয়েছিলেন।

তাই যারা বয়সের ব্যবধান না দেখে নিজ স্বার্থে কমবয়সী মেয়ে খুঁজেন, তারা বিষয়টি নিয়ে একটু ভাববেন আশা করি।

২। অনেকে চমৎকার একটা কথা বলে থাকেন। কথাটা হচ্ছে, 'অল্প বয়সে বিয়ে হলে সমাজে বিশৃঙ্খলতা ছড়ানোর সম্ভাবনা কমে যাবে।' যদিও এটি সমাজে প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার পেছনে বিদ্যমান সমাজব্যবস্থা দায়ী। সচরাচর দেখা যায়, বিয়ের পরে অধিকাংশ মেয়ের পড়াশোনা হয় না। কারণ, কোনো মেয়ে কারো সংসারে বউ হয়ে আসলেই পরিবার তার উপর কিছু অতিরিক্ত দায়িত্ব আরোপ করে দেয়। বলতে গেলে অন্যের কাজের ভারটাও তার উপর দিয়ে দেয়। যে কারণে কাজের চাপে স্বাভাবিকভাবেই পড়াশোনার প্রতি মেয়েটার অনাগ্রহ জন্মায়।

অনেকে বলতে পারেন, বউয়ের এতো পড়াশোনা করার দরকার কী? তাদের মনোভাব হলো, নিজের মেয়ে পড়াশোনা করতে পারলেও পুত্রবধুর তা দরকার নেই। এক পরিবারের অভিভাবককে বলতে শুনেছি, তার মাস্টার্স পড়ুয়া ছেলের জন্য কমবয়সী ইন্টার পড়ুয়া মেয়েকে বউ হিসাবে খুঁজবে। বিয়ের পরে আর পড়াশোনা করাবে না। তারা আসলে একজন শিক্ষিত বউয়ের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারছে না। বয়সের সাথে সাথে শিক্ষাগত যোগ্যতা মানুষের অভিজ্ঞতা বাড়ায়। এই অভিজ্ঞতা একক কর্তৃত্ব স্থাপনের জন্য নয়, বরং পরিবারকে সহায়তার জন্যই দরকার। হ্যাঁ, আমি জানি কিছু শিক্ষিত মেয়ের অহংকারী মনোভাবের কারণে পরিবারগুলোর ধারণা এমন হয়ে গিয়েছে যে, দরকার নাই শিক্ষিত মেয়ে বিয়ে করার। অহেতুক অহংকার আর পড়াশোনার গরম দেখাবে। মুরুব্বিদের সম্মান করবে না। ঘরে থাকতেই চাইবে না।"

কোনো কোনো শিক্ষিত মেয়ের এমন মনোভাবের একটা কারণ হলো আমাদের ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা আমাদেরকে যান্ত্রিক করে তুলছে। মন-মানসে বস্তুবাদী

www.pathagar.com

চিন্তার অনুপ্রবেশ ঘটাচ্ছে, 'সত্যিকারের মানুষ' হতে বলছে না। এই ব্যবস্থা বিজ্ঞানের উৎকর্ষতা দেখায়, তবে বিজ্ঞানের সৃষ্টিকর্তার কাছে মাথা নত করতে শেখায় না। সুদের অংক শেখায়, অথচ সুদীব্যবস্থা কীভাবে পুঁজিবাদী সমাজ গঠন করে পুরো দেশকে এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে, তা এড়িয়ে যায়। যেখানে নৈতিকতার শিক্ষা নেই, সেখানে একটা মানুষের অহংকারী হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

তাছাড়া কিছু সংগঠন রয়েছে যারা মেয়েদের এই বলে উসকানি দেয়, 'এখন তুমি শিক্ষিত, কারো ওপর নির্ভরশীল নও। এখন তুমি অন্যের ধার ধারতে যাবে কেনো?' আসলে এ ধরনের কথাগুলো মূলত মানব মনে উঁচু-নিচুর ভেদাভেদ সৃষ্টি ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না। বাস্তবতা হলো, মানুষ সামাজিক জীব। মানুষ একা বাস করতে পারে না। আমরা মূলত একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। এই নির্ভরশীলতা নিছক টাকাপয়সা কিংবা পড়াশোনার ওপর ভিত্তি করে নয়, এর পেছনে মূলত কাজ করে মন-মানসিকতা।

আবার যারা বলেন, নারী শিক্ষার দরকার কী? তাদের উদ্দেশে বলতে চাই, একজন নারীর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার যেমন প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তেমনি রয়েছে ধর্মীয় শিক্ষার। কারণ, ধর্মীয় শিক্ষা ছাড়া সেই মেয়েটার মানসিকতায় পূর্ণতা আসবে না। মুরুব্বিদের সম্মান করবে না। তাছাড়া স্ত্রী যদি জ্ঞানের বিচারে অজ্ঞ হয় তাহলে স্বামীও যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে তাকে সাথে রাখবে না। স্বামীর মধ্যে একটা ধারণা কাজ করবে 'দূর! সে কী বুঝে'! তাছাড়া মা হিসেবেও নারী তার সন্তানের উত্তম শিক্ষক হতে পারবে না।

সুতরাং পরিস্থিতি যাতে সেই রকম না হয় এবং স্বামী-স্ত্রী যাতে পরস্পরের সহযোগী হয়, সেদিকে খেয়াল রেখে ছেলে-মেয়ের কম বয়সে বিয়ে হলেও ছেলের যেমন পড়াশোনা করা উচিত তেমনি মেয়েটিকেও পড়াশোনার পরিবেশ দেয়া উচিত।

৩। আমরা যেখানে বিয়ের মতো একটি পবিত্র কাজের রাস্তা সহজ করতে চাচ্ছি, কম বয়সী হলেও সমাধান কী হতে পারে তা খুঁজে বের করছি; সেখানে কম বয়সে বিয়ে না করানোর জন্য রীতিমত যুদ্ধ শুরু করেছে কিছু বস্তুবাদী সংগঠন। তারা বিয়েটাকে নিছক বংশবিস্তারের পর্যায়ে রেখে বাল্যবিবাহের ইস্যুকে পুঁজি করে অল্প বয়সে বিয়ের বিরুদ্ধে তোলপাড় শুরু করে দেয়। এ কারণে অনেক সময় ছেলেপক্ষ-মেয়েপক্ষ রাজি থাকলেও দেখা যায়, বিদ্যমান সরকারী রেজিস্ট্রেশনের বৈধতার চাপে পড়ে তাদের বিয়ে হতে পারে না। শুধু তাই নয়, গ্রামে এমনও হয়েছে, মেয়ের বয়স ১৮'র নিচে – এই খবর পাওয়া মাত্রই কোনো এক সংগঠন এসে বিয়ে ভণ্ডুল করে দিয়েছে। এসব সংগঠন বিয়ের উদ্দেশ্যটাকে শুধু বংশবিস্তারের মাধ্যম হিসাবে দেখে। আর তার ওপর ভিত্তি করে বাল্যবিবাহ নিয়ে নিত্যনতুন শ্লোগান প্রচার করে। এদের ১৫-১৬ বছরের ছেলে-মেয়ের প্রেম নজরে পড়ে না। ডাস্টবিনে পড়ে থাকা অবৈধ নবজাতকের লাশ চোখে পড়ে না। তাদের কাছে ১৮ বছরের ছেলে-মেয়ে হলো শিশু!

www.pathagar.com

জানি, সেইসব সংগঠন কমবয়সী মেয়েদের স্বাস্থ্যঝুঁকির কথা বুঝাচ্ছে। তারও একটা সুষ্ঠু সমাধান আছে। তবে সেই জন্য বিয়ে আটকে থাকবে কেনো? যদি স্বাস্থ্যঝুঁকির কথা আমরা মেনেও নেই, তাহলেও বিয়ে আটকিয়ে রাখা উচিত নয়। তার চেয়ে বরং ভালো হয়,কাবিন করে নেয়া তথা বিয়ে পড়িয়ে দেয়া। এবার ছেলে-মেয়ে যত ইচ্ছা কথা বলুক। অন্তত তারা স্বামী-স্ত্রীর বন্ধনে থাকবে, গুনাহগারও হবে না। পরে মেয়ের বয়স ১৮ হলে রেজিস্ট্রেশন অফিস থেকে কাবিননামা তুলে ছেলের বাড়িতে উঠিয়ে দেয়া হবে। তবে এই সমাজের সমস্যার যেনো শেষ নেই। তাদের দৃষ্টিতে, মেয়েকে দেরি করে ছেলের বাসায় দিলে বউ আর নতুন থাকে না, পুরাতন হয়ে যায়!

যাই হোক, অহেতুক, অমূলক ধ্যান-ধারণা, কুসংস্কারের কারণে দিন দিন সামাজিক ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে, বিশৃঙ্খলতা ছড়াচ্ছে। এ জন্য আমাদের অনৈতিকতাকে দায়ী করা হলেও পরিবার তথা সমাজের দায়বদ্ধতাও কম নয়।

www.pathagar.com

বিয়ের বয়স ১৬, ১৮ নাকি ২০?

সম্প্রতি 'উইমেন এনভয়' নামের একটি সংগঠন নারীদের বিয়ের বয়স ২০ করার দাবি জানিয়েছে। আমি মনে করি, বিয়ের ক্ষেত্রে বয়সের কোনো সীমা ঠিক করে দেয়া যায় না। বরং, ছেলে-মেয়ে সাবালক হয়ে পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারটা যখন বুঝবে, তখনই তারা 'বিয়ে' জিনিসটা বুঝতে পারে। তবে, একটা চমৎকার ব্যাপার হলো, শারীরিক বা মানসিকতার ভিত্তিতে ছেলেমেয়েরা বিভিন্ন বয়সে সাবালক হয়।

তবে আমাদের সমাজের একটা মারাত্মক ব্যাপার ঘটছে। অবশ্য বিশ্বব্যাপীই এটা ঘটছে। এটা নিয়ন্ত্রণ করা পরিবারের অবশ্য কর্তব্য। ব্যাপারটা হলো, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা টিভিতে বড়দের সিরিয়াল দেখে, নেটে নিষিদ্ধ সাইট ভিজিট করে, খারাপ বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে অল্প বয়সেই প্রেম-ভালোবাসা বুঝে যাচ্ছে। ফলে তারা বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে বটে, তবে বিয়ে জিনিসটা কী, একে-অপরের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য কী, প্রকৃতই সেটা বুঝতে পারছে না। এসব না বুঝায়, তাদের অপরিপক্ক সম্পর্কে বড়রা বাঁধ সাধলে তারা আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে। এটা থেকে বাঁচার দুটি পথ আছে:

১। সন্তানদের ব্যাপারে অভিভাবকদের আরো সচেতন হতে হবে। তাদের বয়স অনুযায়ী সুস্থ বিনোদনের ব্যবস্থা করার পাশাপাশি নৈতিকতা তথা ধর্মীয় জ্ঞান দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

২। অনেক চেষ্টা, অনেক সংগ্রাম স্বত্বেও আপনার সন্তান ১৬-১৭ বছর বয়সে কাউকে পছন্দ করে বসতে পারে। সেক্ষেত্রে অহেতুক শর্তারোপ কিংবা অহেতুক কারণ দর্শিয়ে তাদের পছন্দকে নাকচ করার পরিবর্তে বিবেচনা করুন। নৈতিকতা ভালো দেখলে দুই পরিবার একত্রে তাদের সম্পর্ককে স্থায়িত্ব দেয়ার ক্ষেত্রে এগিয়ে আসুন। সম্ভব হলে কাবিন করে রাখুন। যাতে তারা একান্তে কথা বললে বা মেলামেশা করলেও সেটা বৈধ হয়। পরবর্তীতে না হয় আনুষ্ঠানিকভাবে মেয়েকে উঠিয়ে নেয়া হবে।

একটা বিষয় লক্ষ করে দেখবেন, আমরা সাধারণত বিয়েকে পড়াশোনা বা ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হিসাবে দেখি। অথচ একটা ছেলে বা মেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে কিংবা কর্মক্ষেত্রে কারো সাথে সম্পর্ক রাখলে সেটাকে ঠিকই জায়েজ করে ফেলি!অথচ আমাদের সহপাঠী যদি আমাদেরই জীবনসঙ্গী হতো, আমাদের কর্মজীবনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যদি সে সহায়ক হতো, তাহলে কি সেটা উত্তম হতো না? অথচ অনেক পরিবারেই শুনি, "না,

www.pathagar.com

আমার ছেলের বয়সই বা কি? সবে ভার্সিটিতে পড়ে। এখন বিয়ে দিলে বউ তাকে পড়তে দিবে না।" আবার মেয়েদের ক্ষেত্রেও একই কথা, "বিয়ের পরে পড়া হবে না।" হ্যাঁ, অনেক মেয়েরাও (যাদের পড়ার আগ্রহ থাকে) এইচএসসি বা অনার্সে থাকতে বিয়ে করতে চায় না। কারণ তারা জানে, শ্বশুর বাড়ির লোকজন নিজের মেয়েদের পড়াশোনা করতে দিলেও পুত্রবধূকে পড়তে দিবে না। এই ব্যাপারটা আমি আগের লেখায়ও উল্লেখ করেছি।

সুতরাং, সমাজে বিদ্যমান এসব সমস্যাগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। নিজ থেকে বুঝতে হবে। যাতে বিয়েটা সহজ হয়। পরিবারের সবাইকে নিজের কাজ নিজে করার মানসিকতা গড়তে হবে। আর রইলো পরিবারের বয়স্কদের সাহায্যের কথা। এটা অবশ্যই পরিবারের সবাইকেই খেয়াল রাখতে হবে। আরেকটা বিষয় হলো, মেয়েরা বাপের বাড়ি থাকলে পড়াশোনার পরিবেশ যেমন পায়, তেমনি মাকেও সংসারের কাজে সাহায্য করে। একইভাবে, স্বামীর বাড়িতে তার মা-বাবাকেও নিজের মা-বাবার মতো দেখবে, সেই সাথে শ্বশুর-শাশুড়িরও উচিত বউয়ের প্রয়োজনটা বুঝা, তাকে যথাযথ পরিবেশ দেয়া।

হ্যাঁ, এটা ঠিক, বউকে চালানো তথা পরিবারের আর্থিক দায়িত্ব ছেলের ওপর হলে বিয়ের আগেই তার উপার্জনক্ষম হওয়া জরুরি। তবে সমাজে এমনও আছে,ধনী বাবার ছেলে বিয়ের জন্য একপায়ে খাড়া। বয়সও হয়েছে পঁচিশের মতো। অথচ বাবার উক্তি, "নিজে কামাই কইরা বিয়া কর। আমি তোর বউরে চালামু ক্যান?" অথচ পরিবারে একজন সদস্য যোগ হলে কী এমন ক্ষতি হবে? হ্যাঁ, একজন মানুষের খাবার ছাড়াও কিছু প্রয়োজন থাকে, সবসময় আবার শ্বশুর-শাশুড়ির কাছে চাইতেও অস্বস্তি হয়। তাই আমি মনে করি, বিবাহে আগ্রহী ছেলেকে অভিভাবকের কাছে বিয়ের আগ্রহ প্রকাশের পাশাপাশি আয়-রোজগারের চিন্তা করাও উচিত। সুতরাং, ছেলের নিজের দায়দায়িত্বগুলো যেমন তার বুঝা উচিত, তেমনি অভিভাবকের উচিত সন্তানকে অবুঝ বা বাচ্চা না ভেবে সামর্থ্য থাকলে বিয়ের ব্যবস্থা করা। অন্তত ছেলের নৈতিকতা যাতে নষ্ট না হয়, সে দিকে খেয়াল রাখা।

আরেকটা বিষয় লক্ষণীয়, গ্রামাঞ্চলে মেয়েরা বিয়ে করতে না চাইলেও তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে দেয়া হয়। কারণ অভিভাবকরা নানা ধরনের শঙ্কায় থাকেন। আমি মনে করি, শঙ্কাগুলোর সমাধান বের করে মেয়ের ভালো চিন্তায় তার পাশে থাকা উচিত। জোর করে মেয়েদের বিয়ে দেয়ার কথা ইসলাম বলে না। কারণ বিয়ের পূর্বশর্ত হলো, ছেলে-মেয়ে উভয়কে বিয়েতে রাজি থাকতে হবে। অথচ আমাদের সমাজে বিয়ের ক্ষেত্রে মেয়ের পছন্দকে প্রায় সময়ই মূল্যায়ন করা হয় না।

আমরা জানি, বিয়ের ক্ষেত্রে বয়সের সীমা উল্লেখ করা হয় সন্তান নেয়ার সক্ষমতা ও নারীর সুস্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে। তাই আমি আগেও উল্লেখ করেছি, কাবিন হলেও মেয়েকে স্বামীর বাসায় পরবর্তীতে তুলে দেয়া হোক। যদিও বাস্তবে দেখা যায়, অনেক মেয়েরা ১৮ বছরের আগেই সন্তান নেয়ার মতো স্বাস্থ্যবতী হয়ে উঠেন।

www.pathagar.com

আরেকটা বিষয় না বললেই নয়, অনেকেই বয়সের প্রতিবন্ধকতা দেখিয়ে কিংবা ক্যারিয়ারের কথা বলে বিয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছেন। এরা মূলত সন্তানকে জীবনের সবচেয়ে বড় বোঝা মনে করেন। হ্যাঁ, তথাকথিত আধুনিক সমাজে সন্তানকে একটা মেয়ের বোঝা হিসাবে প্রচার করা হচ্ছে। 'বিয়ে হলে, সন্তান নিলে ক্যারিয়ার শেষ' - এমন প্রচারণাই চলছে। যদিও বন্ধ্যাত্বের মানসিক যন্ত্রণা কত তীব্র তা আমার পরিচিত অনেক পরিবারেই দেখছি। চিকিৎসা করেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোনো লাভ হয় না। কু'রআনে আল্লাহ যা বলেছেন, তা কতোই না সত্য!

> *তিনি যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন; যাকে চান কন্যা সন্তান দান করেন, আবার যাকে চান তাকে পুত্র সন্তান দান করেন, যাকে চান তাকে পুত্র কন্যা (উভয়ই) দান করেন, (আবার) যাকে চান তাকে তিনি বন্ধ্যা করে দেন; নিঃসন্দেহে তিনি জানেন, ক্ষমতাও তিনি বেশি রাখেন।* (সূরা শূরা: ৪৯-৫০)

তাছাড়া বর্তমানে নারীরা অধিক হারে জরায়ু ক্যান্সারে ভুগছে। অনেক নারীকেই জরায়ু ফেলে দিতে হচ্ছে। এমনও এক মেয়ের ব্যাপারে শুনেছি, বিয়ের আগেই তার জরায়ু ফেলে দিতে হয়েছে। এখন তার ভাবনা, কোনো ছেলে তার হাত ধরবে কি?

সুতরাং, যারা সন্তানকে বোঝা ভাবেন তাদের জন্য এগুলো হতে পারে সুখবর। তাদের জন্য আরেকটা সুখবর হচ্ছে ১৯৭৫ সালে যেখানে আমাদের দেশে প্রজনন ছিলো শতকরা ৬.৩, সেখানে বর্তমানে দাঁড়িয়েছে অর্ধেকেরও কম ২.৩ এ।

তাই বলবো, যারা বিয়ের ক্ষেত্রে বয়সের সীমা টেনে দিচ্ছেন,নিত্য-নতুন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছেন, তারাই মূলত সুন্দর সমাজ ও পরিবার গঠনের শত্রু।

www.pathagar.com

বিয়ের আগে ভালোলাগা

সেদিন এক ক্লাসমেটের বিয়ের ছবি দেখে খুশি হলাম। মেয়েটি এক ছেলেকে পছন্দ করতো। তাদের মধ্যে ভালোই ঘুরাফেরা চলছিলো। বিষয়টা খুব সহজেই ধরা পড়ে যখন দেখতাম, মেয়েটা বাসা থেকে সেজে আসতো না। কিন্তু ক্যাম্পাসে এসে সেজেগুজে তারপর বের হতো। যাক, আল্লাহ তাদেরকে পাপ থেকে বাঁচালেন। কারণ, বিয়ে বহির্ভূত সম্পর্ক রাখা পাপ।

যাই হোক, যেহেতু 'বিয়ের আগে ভালোবাসা' নিয়ে কথা উঠেছে তাই বলি, বিয়ের আগে কাউকে ভালো লেগে গেলে অহেতুক ঘুরাঘুরি না করে সরাসরি হোক বা কারো মাধ্যমে হোক প্রস্তাব দেয়া উচিত এবং মা-বাবাকে বলা উচিত। সেই সাথে বিশ্বাস রাখতে হবে, সে যদি আমার ভাগ্যে থাকে তাহলে আসবেই, আর না হলে না। তারপর মা-বাবা রাজি হলে তো হলো; না হলে ধরে নিতে হবে, হয়তো সে আমার ভাগ্যে নেই, অন্য কারোর জন্য নির্ধারিত। অন্য কারো অধিকারকে তো আমি হরণ করতে পারি না!

তাই যত কষ্টই হোক সেই মানুষ থেকে নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে চলাই উত্তম। এই উত্তম কাজটা করতে হবে মূলত নিজের ভালোর স্বার্থেই। কেননা মা-বাবার বারণ সত্ত্বেও আমরা যদি অনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখি, তবে নিজেরাই মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হবো এবং আমাদের ভাগ্যে যে আছে তার সাথেই যেনো পরোক্ষভাবে বেঈমানি হলো। শুধু তাই নয়, অনৈতিক সম্পর্কের রেশ থাকলে একজনের সাথে বিয়ে হওয়ার পরও দেখা যায় লোকেরা পরকীয়ায় জড়ায়। যা খুবই জঘন্য পাপ।

এতো কথা বলার কারণ হলো, মেয়েটা যাকে পছন্দ করতো তার সাথেই বিয়ে হয়েছে, নাকি পরিবারের পছন্দে হয়েছে, তা আমি জানি না। কারণ, এমন মেয়েও আমি দেখেছি, যে এক ছেলের সাথে ভালোই ঘুরাঘুরি করতো। বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে গিয়ে ছবি তুলে ফ্রেন্ডদের দেখাতো। অনেকদিন পর তার বিয়ের কথা শুনে যখন জিজ্ঞাস করলাম, 'এ কি সেই ছেলেটা?' তার জবাব ছিল, 'না। সেই ছেলের ব্যাপারে পরিবার রাজি হয়নি।'

মনে মনে বলি, পরিবারের সম্মতির ব্যাপারটা কি ঘুরাফিরার আগে জেনে নিলে ভালো হতো না? নিজের আবেগের সাথে প্রতারণা করার কী দরকার? নিছক একটা অপ্রিয় অতীত হয়ে থাকা সত্ত্বেও বর্তমানে অন্য কারো হাত ধরা! আবেগ-ভালোবাসা সবকিছু বোধহয় এতই সস্তা! নাকি আমরাই একে সস্তা করে ফেলেছি?

www.pathagar.com

আন্তঃধর্ম ভালোবাসার পরিণতি

২৫ এপ্রিল ২০১২। ঢাকা। রামপুরার এক বাসা থেকে পাওয়া গেছে রুবেনা সুলতানা তন্নীর ঝুলন্ত লাশ। কী ছিলো তার অপরাধ? অম্লান সাহা নামের এক হিন্দু ছেলেকে সে ভালোবেসে ছিলো। ছেলেটিকে বিয়ে করতে চাইলেও ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হওয়ার কারণে স্বভাবতই পরিবার থেকে বাধা আসে। তাই সে চরম হতাশা আর আবেগের বশে নিজের জীবনটাকে ধ্বংস করাই শ্রেয় মনে করলো। অবশেষে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীকে ভালোবাসার বাস্তবতা তন্নীর লাশ হয়ে আজ জাতির সামনে হাজির!

অনেকে হয়ত বলতে পারেন, তন্নীর পরিবারের বাধা দেয়া উচিত হয়নি। আবার অনেকেই বলবেন, এসব দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্যই তো সরকার আন্তঃধর্ম বিবাহ আইন করতে যাচ্ছে। যে আইনে ভিন্নধর্মী দুইজন বিয়ে করতে চাইলে কেউ বাধা দিতে পারবে না। যার যার ধর্ম তার তার কাছে। এই আইনটি দ্রুত করা উচিত, যাতে করে তরুণ-তরুণীদের হতাশ জীবন আর দেখতে না হয়।

প্রশ্ন হলো, আসলে কি তাই? প্রথমত, ধর্মকে বাধা হিসাবে দেখে নিজের জীবন থেকে ধর্মকে দূরে সরিয়ে রাখা বা নামের মধ্যে ধর্মকে নিছক টাইটেল হিসাবে ঝুলিয়ে রাখার অভিপ্রায়কে নির্বুদ্ধিতাই বলা যায়। যারা না বুঝে ধর্ম, না ভালোবাসা, আর না বুঝে বিয়ে। ধর্ম হলো আমাদের অস্তিত্ব। আমাদের জীবন গড়ার কৌশল। ইহকাল ও পরকালের দলীল স্বরূপ। অপরদিকে, ভালোবাসা হলো আমাদের অস্তিত্বে সুখ-দুঃখের অনুভূতির একটা মাধ্যম। বিয়ে সেই ভালোবাসাকে সফল পরিণতি দেয়।

এখন প্রশ্ন হলো, আমাদের অস্তিত্বই যদি না থাকে, তাহলে এই ঠুনকো ভালোবাসা বা বিয়ে দিয়ে কী হবে? অনেকেই বলেন, ধর্ম আলাদা হয়েছে তো কী হয়েছে? বিয়ের পর সে তার ধর্ম এবং আমি আমার ধর্ম মেনে চললেই তো হলো।" আসলে ওসব নাটক-সিনেমার কাহিনী পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। যেমন আজকাল ভারতীয় চলচ্চিত্রগুলোতে (যার প্রভাব বাংলাদেশে অনেক বেশি) ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে প্রেম-বিয়ের কাহিনী দেখা যায়। কিন্তু বাস্তবতা এসব কাল্পনিক কাহিনীর চেয়ে ভিন্ন।

তর্কের খাতিরে যদি ধরে নিলাম, হিন্দু-মুসলিম স্বামী-স্ত্রী উভয়েই নিজ নিজ ধর্মকে শ্রদ্ধা করে। স্বামী-স্ত্রী যথাক্রমে নামাজ ও পূজা করে। কিন্তু মুসলমান হিসাবে ন্যূনতম এই জ্ঞানটুকু থাকা আবশ্যক, ইসলাম মূর্তিপূজা সমর্থন করে না। তাহলে একজন মুসলিম স্বামী কীভাবে

www.pathagar.com

মেনে নেয়, সে ইসলাম মেনে পরকালে আরামে থাকবে, আর তার জীবনসঙ্গী মূর্তিপূজা তথা শিরক করে পরকালে পাপের ভাগিদার হবে? সে কি তাকে আসলেই ভালোবাসে? অপরদিকে, একজন হিন্দু নারীও এই বিশ্বাস নিয়েই পূজা করে, এটা না করলে স্রষ্টা অসন্তুষ্ট হবেন। তাহলে স্রষ্টার সন্তুষ্টির জন্যে কেনইবা সে তার স্বামীকে এই পথে আহ্বান করবে না? একজন যদি আরেকজনকে বিপথে দেখে সাহায্যই না করে, শুভাকাঙ্ক্ষীই না হয়, তাহলে এ কেমন ভালোবাসা? এ কেমন বিয়ে?

আর যা না বললেই নয় তাহলো, সৃষ্টিকর্তার ইবাদত লোক দেখানো কোনো আনুষ্ঠানিকতা নয়, এর পেছনে তাৎপর্য আছে। যা না বুঝার কারণে আমরা প্রতিনিয়ত ভুল করছি, ভুল পথে চলছি। আমরা মন দিয়ে এই তাৎপর্য উপলব্ধি করি না। তাই একই মন নিয়ে কখনো নামাজ পড়ি, আবার কখনো নিজে পূজা না করা সত্ত্বেও ভালোবাসার মানুষটির কারণে মন্দিরে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকছি। নিজের স্বামী বা স্ত্রীকে সৎ কথা বলতেও আমাদের মধ্যে সংকোচবোধ কাজ করে।

তাছাড়া আন্তঃধর্ম আইন হয়ে গেলে সমস্যা শুধু এক জায়গায় হবে না। আমরা সামাজিক জীব। পরিবারের সাথে মিলেমিশে থাকতে ভালোবাসি। তেমনি সমাজে বিদ্যমান অনেক ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা মানতে হয়। তাই ভিন্নধর্মী বিয়েতে এসব অনুষ্ঠান মানতে গিয়ে ছেলে-মেয়ে উভয়কেই বিপদে পড়তে হবে। আর না মানলে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হবে।

তাই একটা কথা বলা উত্তম মনে করি। তাহলো, নিজ নিজ ধর্ম জেনে সেই আলোকে জীবন পরিচালনার পাশাপাশি ভালোবাসার মানুষটিকেও সেই ধর্মের প্রতি আহ্বান করা উচিত। তাছাড়া মা-বাবার ধর্ম আলাদা হলে সন্তানদের উপর এর প্রভাব পড়ে সবচেয়ে বেশি। বাবার ধর্ম পালন করবে, নাকি মায়ের ধর্ম? – এই দ্বিধাদ্বন্দ্ব তার সহজে কাটে না। এই পরিস্থিতি তাকে নাস্তিকতার দিকে ঠেলে দেয়। তাই ধর্মীয় পার্থক্য সত্ত্বেও শুধু আবেগের বশে সিদ্ধান্ত নিলে তা আগামী প্রজন্মের বিপথে যাওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। সচেতন মানুষ হিসেবে নিশ্চয়ই আমরা তা চাই না।

সমাজের নীতিনির্ধারকদের কেউ কেউ আমাদের ধর্মের উপর আঘাত দিতে চাইলেও এ দেশের মাটি ও অধিকাংশ পরিবার থেকে আজও ধর্মীয় মূল্যবোধ উধাও হয়ে যায়নি। পরিবার জানে, আজ তার সন্তান ভিন্ন ধর্মের কাউকে বিয়ে করলে কাল পরবর্তী প্রজন্ম 'আমার ধর্ম কোনটা' বলে যখন প্রশ্ন করবে, তখন তার উত্তর থাকবে না। অনেকে বলেন, শিশু প্রাপ্তবয়স্ক হলে নিজেই বিবেচনা করবে। নিজের পছন্দ অনুযায়ী ধর্ম বেছে নিবে। হ্যাঁ, সন্তানের বুঝ হলে সে নিজ থেকেই যাচাই-বাছাই করতে শেখে। ছোটবেলার প্রাপ্ত শিক্ষায় ভুলত্রুটি আছে কিনা, তাও যাচাই করতে শেখে। তবে সন্তান যখন অবুঝ থাকে, তখন মা-বাবার একটা কর্তব্য থাকে। সেই সময় ধর্মের পাঠ দিতে হয়, জানাতে হয়, বুঝাতে হয়। কিছু কর্ম ও নিয়ম শেখাতে হয়। যেমন কীভাবে স্রষ্টার ইবাদত করতে হয়, কীভাবে নামাজ

www.pathagar.com

আদায় পড়তে হয় – এইসব ছোটবেলা থেকে না শেখালে বড় হয়ে তার অভ্যাস গড়ে ওঠে না।

অবাক হতে হয়, যে ধর্ম বিয়েকে বৈধতা ও পবিত্রতার সার্টিফিকেট দিয়েছে, যে পবিত্র বন্ধনের প্রতি মানবজাতিকে উৎসাহিত করেছে, আজ তাকেই 'বাধা' হিসাবে আখ্যায়িত করা হচ্ছে! অবমূল্যায়ন ও তুচ্ছজ্ঞান করা হচ্ছে! এই জাতির বিবেক কি মাটি চাপা পড়ে গেছে? সবকিছু আবেগের বশে মেনে নেয়া যায় না। নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ রেখে যে বাস্তবতাকে বুঝতে পারে, সে-ই প্রকৃত সফল ব্যক্তি।

তাই এবার আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে, আমরা কী চাই? আত্মহত্যা, হতাশা, নাকি সুখী জীবন। প্রশাসন যে উগ্র ও অসামাজিক আইন করে আমাদের তরুণ সমাজকে ভিতর থেকে ধ্বংসের পরিকল্পনা করছে, তাদের এই পদক্ষেপকে ব্যর্থ সাব্যস্ত করতে হবে। দুর্বলতা ভেঙে জোরালো প্রতিবাদ করতে হবে। যাতে আগামী প্রজন্ম ব্যর্থতার দায়ে আমাদেরকে দায়ী না করে।

www.pathagar.com

আমরা যখন মাথার বোঝা

কথাটা ধর্মীয় আলোকে নয়, বিদ্যমান সমাজের বাস্তবতার আলোকে বলা। যেখানে আমাদেরই বোনেরা কখনো বাবার কাছে, কখনোবা স্বামীর কাছে বোঝা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। কোনো নিকটাত্মীয় কিংবা স্বয়ং বাবা যদি মেয়েকে সামনাসামনি বোঝা বলে অভিহিত করে, তখন মেয়েটার মানসিক পরিস্থিতি কেমন হয়, ভেবে দেখুন। জন্মের পর থেকেই কেউ কেউ এই তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বড় হয়। এতে মেয়েটি মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়ে, কখনোবা আক্রমনাত্মক মনোভাব গড়ে ওঠে। বিয়ে হতে দেরি হলে এ ধরনের আরো কটুক্তি বেড়ে যায়।

আমাদের সমাজে মেয়ে জন্ম নিলেই আত্মীয়স্বজন এসে বাবার কাছে বলতে থাকে, "হুম। নাও, মেয়ের বাপ তো হয়েছো; এখন থেকেই টাকা জমানো শুরু করো।" ভারতের মতো আমাদের দেশে কন্যা ভ্রূণ দেখলে হত্যা করার প্রচলন না থাকলেও মেয়ে সন্তান জন্ম নিলে অনেক পরিবারের সদস্যদের, এমনকি মা-বাবার পর্যন্ত, মুখ বেজার হয়ে যায়।

এবার কন্যার বিয়ের প্রসঙ্গে বলি। বিয়ে দিতে গেলেই বাবাকে ৩-৪ লাখ টাকা ক্যাশ রাখা লাগে। কারণ, অনেক পাত্রপক্ষ মুখে না বললেও যৌতুকের ব্যাপারে শেষে বলেই ফেলে, 'ওসব দেয়ার কথা কি বলা লাগে? এগুলো তো ঐতিহ্য (!), নবীজী মুহাম্মাদও (সা) তো মেয়ে ফাতিমাকে (রা) বিয়ে দেয়ার সময় কিছু দিয়েছিলেন'। তবে উনারা ভুলে যান, নবীজী শুধু আঁটা পেষার একটা যাতা দিয়েছিলেন মাত্র। কিন্তু আলী (রা) কি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তা চেয়েছিলেন? না। তাছাড়া ইসলামে পাত্রীপক্ষের ওপর বিয়ের খরচের বোঝা দেয়া হয়নি। বরং নতুন জীবন শুরু করতে যদি কিছু লাগে তাহলে সেটা মেয়ের বাবার কাছ থেকে না চেয়ে স্বামীর উচিত নিজেই তা ব্যবস্থা করা। আর স্ত্রীর কর্তব্য হলো, স্বামীর যা আছে তাতে সন্তুষ্ট থাকা। তাই যারা নবীজীর উদাহরণ দিয়ে যৌতুককে বৈধ করতে চান, তাদের কথা যুক্তিহীন।

আমাদের সমাজে এখনো যৌতুক না দিলে শাশুড়ি কথা শোনায়। এই অবস্থার পরিবর্তন দরকার। স্বামী ও স্বামীপক্ষেরই এ ব্যাপারে সচেতন হওয়া উচিত।

যাই হোক, বিয়েতে আনুষ্ঠানিকতা করতে বাধা নেই, বিশেষ করে যাদের সামর্থ্য আছে। তবে সমাজে বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা একদম ঘাড়ের উপর চেপে বসেছে। দেখা যায়, বাবার টাকা নাই, তারপরও অন্যের কাছ থেকে চেয়ে জামাইয়ের কাপড়ের টাকা, বিয়ের বিশাল

www.pathagar.com

আয়োজন, জামাইয়ের আলাদা খাবার ইত্যাদি রীতিনীতি পালন করতে হয়। এগুলো করতে গিয়ে বাবাকে হিমশিম খেতে হয়। ফলে, বাবার কাছে পরোক্ষভাবে হলেও কন্যা সন্তান 'বোঝা' হিসাবে বিবেচিত হয়!

তাছাড়া 'বউ পালা মানে হাতি পালা' কিংবা এ জাতীয় নেতিবাচক চিন্তা অবিবাহিত ছেলেদের মাথায় ঢুকিয়ে দেয়ার কারণে পরবর্তীতে বউ একশ টাকা চাইলেও অনেক জবাবদিহিতা করতে হয়। অপচয়কারী, অবিবেচক স্ত্রীদের কথা এখানে বলছি না, যারা সহনশীল ও উত্তম নৈতিকতার অধিকারী, সে সকল নারীদের কথাই বলছি। এই সমাজ তাদেরকে মূল্যায়ন করে না।

যাই হোক, উপরে সমাজের কিছু বাস্তবিক পরিস্থিতি তুলে ধরেছি। কিন্তু আমরা কি জানি, ইসলাম মেয়েদের ব্যাপারে কী বলে? মেয়ে জন্ম নিলে বাবার জন্য তা জান্নাতের সুসংবাদ বয়ে আনে। বিয়ের পরে একজন নারী স্বামীর অর্ধেক দ্বীন পূর্ণ করে। নেক কাজে স্বামীর আনুগত্য করে। আর যখন সে মা হয়, তখন তার পদতলে সন্তানের বেহেশত নির্ধারিত হয়।

কিন্তু আমাদের সমাজ সেভাবে চিন্তা করে না। পরিবারও সন্তানদেরকে সেভাবে চিন্তা করতে শেখায় না। তাই প্রজন্মের পর প্রজন্ম চলে যাচ্ছে, কিন্তু মানসিকতায় লক্ষণীয় কোনো পরিবর্তন আসছে না।

www.pathagar.com

মোহরানা পাঁচ লাখ টাকা

মানুষ তার প্রিয়জনকে গিফট দেয় সন্তুষ্টচিত্তে, সামর্থ্যের ভিত্তিতে। ক্ষেত্রবিশেষে নির্ধারিত বাজেটের চেয়ে একটু বেশি খরচ করতেও দ্বিধা করে না। তবে এই গিফট দেয়ার ক্ষেত্রে যদি মানসিকভাবে চাপ কাজ করে, দর কষাকষি হয়; তখন সন্তুষ্টি কিংবা ভালোবাসা গৌণ হয়ে পড়ে।

মূল্যবান উপহার তথা মোহরানা প্রদানের ক্ষেত্রে আমাদের সমাজে ঠিক এমনটাই ঘটছে। যে মোহরানা পাওয়াটা স্ত্রীর অধিকার, যা আদায় না করলে স্বামী একজন জিনাকারী হিসাবে সাব্যস্ত হয় এবং যা স্ত্রী'র প্রতি স্বামীর তরফ হতে উপহারস্বরূপ; বর্তমান সমাজের অহেতুক রীতিনীতির যাঁতাকলে সেই উপহার দেয়ার ক্ষেত্রে স্বামীর সন্তুষ্টি কিংবা ভালোবাসা এখন কাজ করছে না। বরং লাখ লাখ টাকা মোহরানা নির্ধারণের পরবর্তী বিরূপ প্রতিক্রিয়ার শিকার হচ্ছে স্বামী-স্ত্রী উভয়ই। সবচেয়ে দুঃখের বিষয় হচ্ছে, এই ব্যাপারটা সম্পর্কে না আমরা বুঝতে পারছি, না আমাদের মুরুব্বিরা উপলব্ধি করছেন।

একটা বাস্তব উদাহরণ দিয়েই বলি। আমাদের পাশের বাড়ির পরিবারটি অস্বচ্ছল। পরিবারের ছেলেটা ছোটখাট একটা চাকরি করে। মাকে নিয়ে ছোট একটা ঘরে থাকে। সম্প্রতি সে বিয়ে করেছে পাঁচ লাখ টাকা মোহরানার শর্তে। অথচ এতো টাকা দেয়ার সামর্থ্য ছেলেটার নাই। তাই হাসবো না কাঁদবো বুঝতে পারছি না।

এ রকম লোক দেখানো মোহরানা রাখার মানে কী? এই পাঁচ লাখ টাকা, যা এখন তার স্ত্রীর অধিকার হয়ে গেছে, আদায় করতে না পারলে পরকালে হিসাবের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে, এই ছেলেটা কি তা জানে? এভাবে প্রতিনিয়ত বিয়ে নামক পবিত্র একটা বন্ধনে আবদ্ধ হয়েও ছেলেরা জিনাকারী আর মেয়েরা অধিকার বঞ্চিত হচ্ছে।

তাই স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, এর জন্য কে বা কারা দায়ী? আসুন ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখা যাক। ছেলের সামর্থ্য আছে কি নেই, সাধারণত তা বিবেচনা না করেই আমাদের সমাজে মেয়েপক্ষ উচ্চ মোহরানা ধার্য করে। সচরাচর তিনটি কারণ এর পেছনে কাজ করে:

১। লোক দেখানো মানসিকতা
২। তালাকের পর আর্থিক লাভ
৩। সুযোগের সদ্ব্যবহার

www.pathagar.com

১। লোক দেখানো মানসিকতা: মেয়ের মোহরানা সম্পর্কে লোকে জিজ্ঞেস করলে যেন গর্ব করে বলা যায়, সে উদ্দেশ্যে পাঁচ লাখ কিংবা তার চেয়ে বেশি মোহরানা ধার্য করা হয়। এই টাকা মেয়েটি আদৌ পাবে কিনা কিংবা ছেলেটির দেয়ার সামর্থ্য আছে কি না, সেটা নিয়ে অভিভাবকদের কোনো ভাবনা নেই। সবার সামনে গর্ব করে বলতে পারাটাই যেনো তাদের প্রাপ্তি। অথচ, ২৮-৩০ বছর বয়সের একটা ছেলে কত টাকা বেতনের চাকরিই বা করে? আর কত টাকাই বা সঞ্চয় করতে পারে? বৈধ পন্থায় উপার্জনক্ষম এই বয়সী একটা ছেলে কি আদৌ পাঁচ লাখ টাকা উপহার দেয়ার সামর্থ্য রাখে? মেয়ের বাবারও কিন্তু এই বয়সে এ ধরনের সামর্থ্য ছিল না। বাস্তবতা জেনেও শুধুমাত্র লোক দেখানোর জন্য উচ্চ মোহরানা ধার্য করার কি কোনো অর্থ হয়? যেখানে তার মেয়ে সেই টাকাটা আসলে পাচ্ছে না?

২। তালাকের পর আর্থিক লাভ: অনেক মুরুব্বি মেয়েপক্ষকে বুদ্ধি দেন, "মোহরানা বেশি রাখো। পরে বনিবনা না হলে যদি তালাক হয়ে যায়, তাহলে অন্তত মোটা অঙ্কের টাকা পাওয়া যাবে।" অর্থাৎ, তারা ধরেই নিচ্ছেন এই ধার্যকৃত মোহরানা ছেলে পরিশোধ করবে না! তারা সেটা আশাও করছেন না! তবে ডিভোর্সের সময় যেন আইনী মোকাবেলা করে তার কাছ থেকে মোটা অংকের টাকা আদায় করা যায়, তাই এই ব্যবস্থা!

অথচ বিয়ের আগে মোটেও তালাকের লোভ (!) দেখানো উচিত নয়। কারণ, তালাক এমন একটা ব্যাপার, যা বৈধ হলেও আল্লাহর কাছে অপছন্দনীয়। ইসলামে বিয়েকে সহজ করা হলেও তালাককে কঠিন করা হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়সীমা, শারীরিক ও মানসিক প্রেক্ষাপট, পরিস্থিতি ইত্যাদি শর্তারোপ করে তালাককে জটিল করা হয়েছে, যাতে মানুষ বেপরোয়া না হয়ে পড়ে।

বিয়ের পর একজনের কোনো একটা দিক অপরজনের কাছে দৃষ্টিকটু মনে হতেই পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার অন্যান্য দিকগুলো উপকারী হতে পারে। সূরা নিসার ১৯ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা যেমনটি বলেছেন, "নারীদের সাথে সদ্ভাবে জীবনযাপন করো। অতঃপর যদি তাদেরকে অপছন্দ করো, তবে হয়ত তোমরা এমন এক জিনিসকে অপছন্দ করছো, যাতে আল্লাহ অনেক কল্যাণ রেখেছেন।" তাই, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরস্পর সমঝোতা করে নিলেই হয়। তবে দোষটা যদি খুব অসহ্যকর হয় এবং সালিশ বিচার করেও কোনো সমাধানে পৌঁছা সম্ভব না হয়, তখন তালাকের প্রক্রিয়া শুরু করা যেতে পারে। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে, পারস্পরিক অমিল যদি এমন পর্যায়ে পৌঁছে যাতে করে একত্রে থাকা আর সম্ভব হচ্ছে না, সেই ক্ষেত্রে বিয়ের সম্পর্ক ভেঙ্গে ফেলার একটা বৈধ উপায় হচ্ছে তালাক।

তাই যেসব স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনের মিল নেই তারা শুধু অপরিশোধিত মোহরানা আদায়ের শর্তের কারণে একত্রে থাকবে, আমরা কি তেমনটা ধরে নিচ্ছি? সমাজে অহরহ তালাক হয়ে যাচ্ছে, নারী তার অধিকার পাচ্ছে না – তেমনটাই তো বরং দেখা যাচ্ছে। এমনকি স্বামী পরকিয়ায় জড়িয়ে প্রথম স্ত্রীকে ফেলে চলে যাচ্ছে। কিংবা, না জানিয়ে গোপনে আরেকটা

www.pathagar.com

বিয়ে করছে। এসব ক্ষেত্রে প্রথম স্ত্রীর মোহরানা আদায় তো হয়ই না, দ্বিতীয় স্ত্রীর বেলায়ও একই ঘটনা ঘটে।

তাই তালাক পরবর্তী বিষয়ের কথা চিন্তা করে অতিরিক্ত মোহরানা ধার্য করা বোকামি। বরং প্রত্যেকটা পন্থা সহজ করলে ভালো কিছু নেয়া যেমন সহজ হবে, তেমনি খারাপ কিছু এড়িয়ে চলা সহজ হবে। অধিকারও আদায় হবে।

তালাকের কথা যখন উঠলোই, তখন এ প্রসঙ্গে নারীদের প্রতি ইসলামের মহত্বের একটা দিক খেয়াল করুন। সূরা বাকারার ২২৯ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, "তোমাদের জন্য এটা কোনো অবস্থায়ই ন্যায়সংগত নয় যে, (বিয়ের আগে) যা কিছু তোমরা তাদের দিয়েছো তা তাদের থেকে ফিরিয়ে নেবে।" অর্থাৎ, বিবাহিত অবস্থায় স্ত্রীকে স্বামী যা কিছু দিয়েছে, তালাকের পর তা ফিরিয়ে নিতে ইসলাম নিষেধ করেছে। যেন স্বামী কোনো অপমান বা ছোটলোকি আচরণ না করে, বরং সসম্মানে স্ত্রীকে বিদায় দেয়। কত সুন্দর ফয়সালা!

৩। সুযোগের সদ্ব্যবহার: অতিরিক্ত মোহরানা ধার্যকে অনেক সময় সুযোগের সদ্ব্যবহার মনে করা হয়। যেমন, মেয়েকে বলা হয়, "যা নেয়ার এখনই নিয়ে নে। পরে এত টাকা পাওয়া যাবে না।" এমন মানসিকতা মেয়ের মগজে ঢুকিয়ে দেয়ার কারণ কী? বিয়ের পর ছেলেটা আর্থিক দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করতে পারবে না, কিংবা মেয়ে কিছু চাইলে তা দেয়া হবে না – তেমনটাই কি ধরে নেয়া হচ্ছে? নাকি স্রেফ লোভের বশবর্তী হয়ে এটি করা হচ্ছে?

আরেকটা মজার বিষয় লক্ষ করে দেখুন। বিয়ের কথা পাকাপাকি হওয়ার সাথে সাথে মেয়েপক্ষ যেমন উচ্চ মোহরানা ধার্য করছে, তেমনি ছেলেপক্ষও বিয়ের পোশাক ও অন্যান্য খরচ বাবদ মেয়েপক্ষের কাছে লক্ষাধিক টাকা দাবি করছে। যৌতুকের টাকা এই হিসেবের বাইরে। কী অদ্ভুদ খেলা! এ যেনো টাকার হাতবদল! এবার সহজ অঙ্ক কষে দেখা যাক। এই প্রক্রিয়ায় ছেলে কিংবা মেয়েপক্ষের কে কত টাকা প্রকৃতপক্ষে পায়? ধরুন, মেয়েপক্ষ মোহরানা বাবদ পাঁচ লাখ, আর ছেলেপক্ষ ছেলের খরচ বাবদ তিন লাখ টাকা দাবি করলো। এখানে একটা কথা বলে রাখি। ছেলেপক্ষের দাবিকৃত টাকা বিয়ের আগেই দিতে হয়। যদিও এটা এই সমাজের বানানো নিয়ম, কোনো ধর্মীয় নির্দেশনা নয়। ফলে বিয়ের আগেই ছেলেপক্ষের হাতে তিন লাখ টাকা চলে আসে।

অপরদিকে, বিয়ের আগে মোহরানার পুরোটা পরিশোধ করা উত্তম হলেও (কোনো কোনো ইসলামী বিশেষজ্ঞদের মতে, কিছু অংশ বিয়ের আগে দিয়ে বাকিটা বিয়ের পরে ধীরে ধীরে পরিশোধ করা যায়) দেখা যায়, ছেলেপক্ষ আংশিক পরিশোধ করে। এটিও মেয়েপক্ষ থেকে প্রাপ্ত সেই তিন লাখ টাকা থেকেই প্রদান করা হয়। ছেলেপক্ষ ভাবে, মেয়েপক্ষ যেহেতু পাঁচ লাখ টাকা দাবি করেছে, তাই এখন দুই লাখ টাকা দিয়ে বিয়েটা করে নিই, পরে তিন লাখ দেয়া যাবে। তবে, 'দেয়া যাবে' বলে এই টাকা সাধারণত আর দেয়া হয় না। কারণ, তিন লাখ তো কম অঙ্কের টাকা নয়। বিয়ের আগে মেয়েপক্ষ থেকে নগদ তিন লাখ টাকা পাওয়ায়

www.pathagar.com

তা থেকে দুই লাখ দিয়ে দিতে কষ্ট হয় না। কিন্তু মোহরানার বাকি তিন লাখ টাকার ধাক্কা বিয়ের পরে টের পাওয়া যায়। তখন মেয়েকে বাকি মোহরানা মাফ করে দিতে বলা হয় কিংবা ছেলেকে কষ্ট করে টাকা সঞ্চয় করে ধীরে ধীরে তা পরিশোধ করতে হয়।

মোহরানা নিয়ে আরেকটি বিষয় বিশ্লেষণের দাবি রাখে। তাহলো, মোহরানা চাওয়ার ক্ষেত্রে ইসলামে যেমন কোনো সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হয়নি, বরং স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে; তেমনি সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় ও বিয়েকে সহজ করার স্বার্থে মোহরানা হিসাবে মেয়েকে কুরআনের একটি আয়াত উপহার হিসাবে শোনানোর নজিরও রয়েছে।

আমরা তরুণ প্রজন্ম কি এই উদাহরণের মর্ম আদৌ বুঝতে পারি? কিংবা যারা এর মর্ম বুঝে, তাদেরকে আমরা কি যথাযথ মূল্যায়ন করছি? কুরআনের একটা আয়াতকে মোহরানা হিসেবে দেয়ার অর্থ কী? মেয়ের সামনে গড় গড় করে পড়ে শোনানো? কুরআনের হাফেজ হিসেবে নিজেকে প্রকাশ করা? শুদ্ধভাবে তিলাওয়াতের যোগ্যতা দেখানো? নাকি আয়াতটির অর্থ, তাৎপর্য, প্রয়োগ, প্রভাব, উপলব্ধি ইত্যাদি জীবন, সমাজ কিংবা রাষ্ট্রের জন্য কীভাবে প্রাসঙ্গিক, তা বুঝিয়ে দেয়া?

আমার মনে হয় শেষোক্তটিই সঠিক। কারণ,কোনো আয়াত যদি এমনভাবে মানুষের সামনে তুলে ধরা হয় যাতে ব্যক্তি তা যথাযথভাবে উপলব্ধি করার মাধ্যমে নিজের জীবনে প্রয়োগ করে চিরস্থায়ী সফলতা পেতে পারে, তাহলে এর চেয়ে দামি উপহার দ্বিতীয়টি আর হতে পারে না। তবে খুব কম মানুষই সেভাবে কুরআন পড়ে। কারণ, এখানে জ্ঞানের মূল্য নেই, তাই জ্ঞানী জন্মায় না। তাছাড়া জ্ঞানী ছেলে খোঁজার মানসিকতাও অধিকাংশ মেয়ের নেই। অভিভাবকরাও মেয়ের জন্য তেমন ছেলে খোঁজে না। সমাজের বাস্তবতা হলো, ছেলে চায় পরী, মেয়ে চায় হিরো। সেই সাথে ধনী পরিবারের মূল্যায়ন বেশি। যেনো বিয়ে নয়, আর্থিক লেনদেন ও টাকাপয়সার হাতবদল।

তাই লোকজনের মানসিকতার পরিবর্তন না হলে সমাজের পরিবর্তন হওয়া অসম্ভব। কত টাকা মোহরানা নেয়া যায়, সেই প্রতিযোগিতা না করে পাত্রের সামর্থ্য মাথায় রেখে মোহরানা ধার্য করা উত্তম। এতে ছেলেটা সহজে ও সন্তুষ্টচিত্তে যেমন মোহরানা দিতে পারবে, মেয়েটিও তার অধিকার সহজে নিতে পারবে। একটা হাদীস উল্লেখ করেই লেখাটি শেষ করছি, "সহজ করো, কঠিন করো না।" (বুখারী ও মুসলিম)

www.pathagar.com

সমস্যা বরের নয়, বউয়ের

ছোটবেলায় ঢাকায় প্রত্যেকটা বিয়ের অনুষ্ঠানে দেখতাম একই সেন্টারে উপর ও নিচ তলায় নারী-পুরুষদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা থাকতো। যদিও ছেলেদের কেউ কেউ মেয়েদের সেকশনে চলে আসতো। তবে চাইলে পর্দা রক্ষা করে অনুষ্ঠান আয়োজনের সুযোগ ছিলো। কিন্তু বর্তমানে কমিউনিটি সেন্টারগুলোর আর্কিটেকচারাল ডিজাইন এমনভাবে করা হচ্ছে, ফলে ছেলেমেয়েদের মধ্যে ফ্রি মিক্সিংয়ের সুযোগ তৈরি হয়েছে। এখন একটা মাত্র বড় হলরুম থাকে, যেখানে নারী-পুরুষ একইসাথে থাকতে হয়। পাশেই ডাইনিং স্পেসে একসাথে বসে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা থাকে। আর হলরুমেরই এক জায়গায় বর-কনের একত্রে বসার ব্যবস্থা থাকে, যাতে সবাই তাদের দেখতে পারে।

যারা নারী-পুরুষের পর্দা নিয়ে ভাবেন না এবং আলাদা ব্যবস্থা করতে অনিচ্ছুক, তারা এই ব্যবস্থাকে ঝামেলামুক্ত মনে করেন। তবে যে সকল নারী পরপুরুষের সামনে সাজসজ্জা না করা এবং যে সকল পুরুষ দৃষ্টি সংযত রাখার বিধান মেনে চলেন, তারা সমস্যায় পড়ে যান। বিয়েতে আপনজনদের সাথে অনেকদিন পর দেখা-সাক্ষাতের একটা সুযোগ হয়। সবাই বেশ সেজেগুজে আসে। সবার মাঝে নিজেকে সুন্দর লাগুক, এমন মানসিকতা কাজ করে। কিন্তু এ ধরনের কো-এরেঞ্জমেন্টের অনুষ্ঠানে পর্দা-সচেতন নারীরা সাজতে পারেন না। বিয়ের অনুষ্ঠানে এসেও হিজাব পরে থাকতে হয়। তাই আমাদেরকে এমন একটা ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে মেয়েরা স্বাচ্ছন্দ্যে সাজতে পারে, ছেলেরাও যেন দৃষ্টির গুনাহ থেকে নিরাপদে থাকতে পারে।

এই ব্যবস্থাটি অবশ্যই বাস্তবায়নযোগ্য। এ জন্য দরকার শুধু প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও পরিবারের সদস্যদের সহযোগিতা। এ ধরনের বিয়ের অনুষ্ঠানে নারী-পুরুষের জন্য বসা ও খাওয়ার জন্য সম্পূর্ণ আলাদা ব্যবস্থা করতে হবে। কমিউনিটি সেন্টার দ্বিতল হলে নিচতলা ছেলেদের জন্য এবং দোতলা মেয়েদের জন্য বরাদ্দ করা যেতে পারে। আর সিঙ্গেল ফ্লোর হলে হলরুমের মাঝখানে পর্দা টেনে পার্টিশন করতে হবে, যেন মেয়েদের প্রাইভেসিতে সমস্যা না হয়। পুরুষদের ডাইনিংয়ে পুরুষ ওয়েটার এবং নারীদের ডাইনিংয়ে নারী ওয়েটার থাকতে হবে।

এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতেই পারে বা অনেক পুরুষ বলতেই পারেন, "আশ্চর্য! আমি আমার মা, বোন, স্ত্রীর সাথে দেখা করতে যেতেই পারি। সেখানে আমাকে কেনো বাধা দেয়া হবে?"

www.pathagar.com

কিংবা এমন কথাও উঠতে পারে, "ওমা! বিয়েতে এসে বউকেই যদি না দেখতে পারি, তাহলে আসলাম কেনো?" অথবা, "দেখুন! আমাদের নজর আর নিয়ত দুটোই ভালো। তাছাড়া আমরা তো বউয়ের মামাতো, ফুফাতো, খালাতো, চাচাতো ভাই, কিংবা দুলাভাই। আমরা আমরাই তো! আমরা আপন মানুষ উপরে গেলে সমস্যা কি?"

উত্তরগুলো ক্রমানুসারে দিচ্ছি।

নিজের মা, বোন, স্ত্রী – কারো সাথে দেখা করতে বা কথা বলতে সমস্যা নেই। তবে আপনি তাদের সাথে দেখা করতে গেলে সেখানে অন্য মহিলাদের পর্দায় ব্যাঘাত ঘটবে। আপনাকে এটা বুঝতে হবে। আপনার নজর অন্য কোনো মহিলার উপর যাবে না, এর কি নিশ্চয়তা আছে? আজকাল যেহেতু সবার হাতে হাতে মোবাইল ফোন আছে, তাই এর সদ্ব্যবহার করা উচিত। ফোন করে আপনার আপনজনকে ডেকে নিন বা প্রয়োজনীয় কথা বলুন। উপরে যাওয়ার দরকার কী?

আমাদের সমাজে এটা বেশ প্রচলিত যে, বিয়ে থেকে আসলেই সবাই জিজ্ঞাস করে, "কি রে, বউ কেমন দেখলি? কি! বউ না দেখেই চলে এলি? তাহলে গিয়েছিলি কী করতে?" আসলে বউ দেখাটা কার জন্য জায়েজ, আর কার জন্য নয়, এটা সবার জানা উচিত। মাহরাম পুরুষ ব্যতীত বউয়ের সাজ দেখার অধিকার কারো নেই। তাই যে কোনো পুরুষের বুঝা উচিত-তিনি বউকে দেখার অধিকার রাখেন কি না। কারো নিয়ত বা দৃষ্টি খারাপ, আমি তা বলছি না। আমরা সবাই সাধারণত ভালো। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যারা ভালো তাদেরকেই শয়তান পেয়ে বসে। কারণ শয়তান আল্লাহর কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েই এসেছে, সে তাঁর প্রিয় বান্দাকে বিভ্রান্ত করবেই। আপনি মামাতো বা ফুফাত ভাই হতে পারেন, তবে নিজের স্বার্থে এবং জীবনকে সহজ করতেই মাহরাম-গায়ের মাহরামের বিধান প্রত্যেক ছেলেমেয়ের জানা উচিত।

ছোটবেলার খেলাধুলার সম্পর্ক বড় হয়ে ভিন্ন রূপ নিতে পারে। তাই সচেতনতাবশত পর্দা মেনে চলতে হয়। কিন্তু তাই বলে পর্দার নামে কথাবার্তা বন্ধ করে দিতে হবে, তা নয়। আমি এক মেয়ের এ ধরনের একটি ঘটনা জানি। সে যখন জেনেছে, খালাতো ভাই গায়ের মাহরাম এবং তাদের সাথে পর্দা করতে হবে, তখন সে তাদের সামনে আসা, এমনকি কথাবার্তাই বন্ধ করে দিলো! অথচ পর্দা মেনে চলা মানে আত্মীয়তা থেকে দূরে সরে যাওয়া বা কথাবার্তা বন্ধ করে দেয়া নয়। পর্দা সম্পর্কের অন্তরায় নয়। আত্মীয়স্বজন আল্লাহর নিয়ামত। আমাদেরকে পর্দাও মানতে হবে, আত্মীয়তার সম্পর্কও রক্ষা করতে হবে। আবার, আত্মীয়দেরকেও তার অপরাপর আত্মীয়ের অধিকার অটুট রাখার মানসিকতা থাকা উচিত। নিজের পর্দা ঠিক রেখে অন্যের পর্দাকে সম্মান করতে পারা উচিত। অর্থাৎ, উভয় পক্ষের মধ্যেই পরস্পরের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা ও তা মান্য করার ইচ্ছা থাকতে হবে।

www.pathagar.com

এজন্যই শুরুতে বলেছি, বিয়ে অনুষ্ঠানের আলাদা ব্যবস্থাপনা তখনই সবার জন্য সহায়ক ভূমিকা রাখবে, যখন পরিবারের সবাই উপলব্ধি করে তা কায়েম করতে সচেষ্ট হবে।

এতক্ষণ মেহমানদের ব্যবস্থাপনা নিয়ে বলছিলাম। এবার বর-কনে প্রসঙ্গে কিছু বলা যাক। পর্দার দিক থেকে বরের কোনো সমস্যা না হলেও যত সমস্যায় পড়তে হয় বউকে। অনেকেই হয়ত বলবেন এবং বলেনও, "আরে! বিয়েতে আবার এত পর্দা করার কী আছে?" হ্যাঁ, অধিকাংশ বর-কনে এবং তাদের পরিবারের মানসিকতা অনেকটা এমনই থাকে। অনেক হিজাবী মেয়ের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, বিয়ের সময় তারা পর্দা মেইনটেইন করেন না।

প্রশ্ন হলো, পর্দা কি তাহলে শুধু বাসা থেকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যাওয়া পর্যন্ত? যদিও পর্দার বিধান তা বলে না। পর্দার নির্দেশনা সবক্ষেত্রে একই। অর্থাৎ, মাহরাম (যাদের সাথে বিয়ে নিষিদ্ধ) ব্যতীত আর সবার সামনেই পর্দা করতে হবে। কিন্তু দেখা যায়, বর নিজেই বন্ধুদের নিয়ে বউয়ের সাথে ফটোসেশন শুরু করে দেয়। হ্যাঁ, নিজের বউয়ের ব্যাপারে অন্যের সামনে সুনাম করা যেতেই পারে। কিন্তু তাই বলে বিয়ের মঞ্চে সাজগোজ অবস্থায় থাকা বউকে গায়রে মাহরাম তথা বন্ধুর সামনে হাজির করা ঠিক নয়। এতে স্ত্রীর তো বেপর্দা হবেই, সেইসাথে তার জীবনের প্রতিও যেনো শত্রুতা করা হয়। স্বামীর বন্ধুর সাথে পালিয়ে যাওয়া, কিংবা তাদের ষড়যন্ত্রে স্বামীর মৃত্যু – এমন অনেক ঘটনা পত্রিকায় আসে। আমি সব বন্ধুদের খারাপ বলছি না। তবে কথাটা সেই আগের মতোই, কেউ জানে না, কখন তার দ্বারা গুনাহ হয়ে যাবে। তাই নিরাপদ থাকা উত্তম। নিজেই নিজের পায়ে কুড়াল মারার মতো কাজ করা থেকে বিরত থাকা উচিত। তবে পরিচয়ের জন্য কখনো বন্ধুর সাথে স্ত্রীর দেখা হওয়াটা আলাদা প্রসঙ্গ। কিন্তু বিয়ের সাজে দেখা ঠিক নয়।

দুঃখের সাথে বলতে হয়, বউয়ের সাজসজ্জা দেখার অধিকার তার স্বামীর থাকলেও কো-এরেঞ্জমেন্টে অনেক গায়ের মাহরাম পুরুষ বউকে দেখে ফেলে। এতে বউ এবং সে সকল পুরুষ, সবাই গুনাহর ভাগিদার হয়। উভয়ের পর্দার বিধান লঙ্ঘিত হয়।

অনেক সময় এমনও দেখা যায়, মেয়েটি ইসলামী মনমানসিকতার হলেও তার পরিবার তেমনটি না হওয়ায় সে বিপাকে পড়ে যায়। বাধ্য হয়ে বিয়ের দিন প্রদর্শনীর পুতুলের মতো মঞ্চে বসে থাকতে হয় মাহরাম-গায়ের মাহরাম নির্বিশেষে সবার দেখার জন্য। আজকাল এমনও হয়, যেহেতু পর্দা লঙ্ঘিত হওয়ার বিষয়টি জানাই থাকে, তাই অনেকে হিজাব পরে বসে থাকে। কিন্তু জাকজমক পোশাক, আর কড়া মেকআপের কী হবে? পর্দা কি তাহলে ঠিক মতো হলো?

সুতরাং নববধূ যাতে স্বাচ্ছন্দ্যে সাজতে পারে এবং কারোই পর্দা যাতে লঙ্ঘিত না হয়, সেদিকে খেয়াল রেখেই বিয়ের অনুষ্ঠানে নারী-পুরুষের পৃথক ব্যবস্থাপনা অতি জরুরি।

www.pathagar.com

পরশ্রীকাতরতা

আমরা অন্যের ভালো দেখতে পারি না। সেই সাথে চলে হিংসা ও অপরের সাথে তুলনা। আবার কাউকে খোঁটা দিতেও দেরি করি না। তাই আজকাল নিজের কোনো শুভ কাজ বা আনন্দঘন মুহূর্তে অন্যদের শামিল করতে অনেকেই সাতপাঁচ ভাবেন। উদাহরণটা বিয়ের বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা থেকেই দেয়া যাক। বিয়ের আনুষ্ঠানিকতাগুলো সবাই নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী করে, কোনো জোরজবরদস্তি নেই। কেউ এসব না করলেও একে ছোটলোকি মনে করার কিছু নেই।

যাই হোক, বরপক্ষ থেকে বিয়ের ডালা আসুক কিংবা কনেপক্ষ থেকে কোনো ডালা যাক – উভয় ক্ষেত্রেই এসব উৎসব মুহূর্তে সবাই নিজের আত্মীয়স্বজনদের ডেকে আনে। যাতে সবাই মিলে একসাথে ডালাগুলো খুলে আনন্দ করা যায়। কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার হলো, আত্মীয়দের কেউ কেউ এগুলো দেখার পর প্রায়ই সামনাসামনি বিরূপ মন্তব্য করে বসেন। যেমন, "আমার অমুকের বিয়েতে এর চেয়ে বেশি ডালা এসেছে।" কিংবা, "হায় হায়! এটা আবার কি দিলো?" এমনকি, কারো ডালার সংখ্যা বেশি দেখলে মনে মনে পরিকল্পনা করে, "আমার বা আমার অমুকের বিয়েতেও অপরপক্ষ থেকে এমনই ডিমান্ড করবো।" আবার কারো বিয়েতে এসব আনুষ্ঠানিকতা না হলে নানা ধরনের কটূক্তিও করা হয়।

ভাবছি সেই গরিব ছেলেমেয়ে, মেয়ের ভাই-বাবার কথা, যাদের এতো সামর্থ্য নেই। তারা কী করবে? এই সমাজ কি তাদের খোঁটা দিতে থাকবে? অন্যদের নানা আয়োজনের কথা তুলে তাদেরকে মানসিক কষ্ট দিবে? নাকি তারাও চাপমুক্ত হয়ে সামর্থ্য অনুযায়ী জীবন উপভোগ করার সুযোগ পাবে? আমাদের হীন মানসিকতার পরিবর্তন না হলে 'মানুষের জন্য সামাজিকতা'র ধারণা উল্টে গিয়ে 'সামাজিকতার জন্য মানুষ' ধারণাটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। যা আদৌ সুখকর নয়।

www.pathagar.com

বিয়ের দাওয়াত যেনো গিফটের বিনিময়ে খাদ্য

আমাদের পাশের বাড়ির পরিবারটা বেশ অস্বচ্ছল। একদিন শুনি সেই বাড়িতে মা তার ছেলেকে বলছে, আজকে শাহানার গায়ে হলুদ।

ছেলে: তো, যাও!

মা: নাহ! যামু না। গেলেই ৫'শ টাকা দিতে হইবো। নিজেরই টানাটানির সংসার। ৫'শ টাকাও অনেক।

ঘটনাটা বলার কারণ হলো, বর্তমানে আত্মীয়তার সম্পর্কটি যেন টাকার কাছে ম্লান হয়ে গেছে। এই যেমন ৫'শ টাকা উপহার দিলে সংসারে আর্থিক অসুবিধা হবে, এই আশঙ্কায় দাওয়াত পেয়েও এই মহিলা অনুষ্ঠানে যাননি। যদি বিয়েতে গিফট দেয়ার 'আরোপিত সামাজিকতা' না থাকতো তাহলে হয়ত তিনি এ ধরনের আশংকা করতেন না। বরং সম্পর্কের টানে বিয়ের দাওয়াতে শামিল হতেন।

যদিও আমরা জানি, লোকজন খুশি মনেই গিফট দেয়, এটা জোর করে চেয়ে নেয়ার বিষয় নয়। তবে আজকাল যেন বিয়েতে গিফট দেয়াটা বাধ্যতামূলক হয়ে গেছে। এমনকি, বিয়েতে কেউ কম মূল্যের গিফট দিলে তার বদনাম করা হয়, তাকে ছোটলোক ভাবা হয়। আজকাল নগদ টাকা উপহার দিতে গেলেও এক হাজারের কম দেয়া যায় না। ঘনিষ্ট আত্মীয় হলে টাকার পরিমাণ আরো বাড়াতে হয়।

বিয়ের দাওয়াত হলো আনন্দ সংবাদ। কিন্তু দাওয়াত পেয়ে মানুষ এখন খুশি হওয়ার চেয়ে গিফট নিয়ে নানা হিসাব কষতে থাকে। অন্যদিকে, যারা দাওয়াত দিয়েছেন তারাও অনুষ্ঠানহুলের এক পাশে টেবিল বসিয়ে গিফট নেয়ার ব্যবস্থা রাখেন। কে কতো টাকা দিলো তা খাতায় লিপিবদ্ধ হতে থাকে। এই কাজের জন্য আপন বিশ্বস্ত কাউকে দায়িত্ব দেয়া হয়। এমনও কিছু পরিবারের কর্তা আছেন যারা গিফটের হিসাবের এই লিপিবদ্ধ খাতাটি সযত্নে তুলে রাখেন। কেউ দাওয়াত দিলে পুরোনো খাতাটি বের করে দেখেন, উক্ত ব্যক্তি তার দাওয়াতে কতো দিয়েছিলো! সে মোতাবেক তাকে গিফট দেয়া হয়। কী অদ্ভূত কাণ্ড! এ কেমন আত্মীয়তা! এ কেমন সম্পর্ক!

এদিকে গিফটের চাপে পড়ে অনেক গরিব আত্মীয়, অনুষ্ঠানে আসেন না। কেউ আসলেও নিজের আর্থিক অবস্থা যেন সবার সামনে প্রকাশ না পায়, সেটি ভেবে কষ্ট করে হলেও গিফট

www.pathagar.com

জোগাড় করে তারপর আসেন। মনে মনে তারা দুঃখ করে বলেন, "সমাজে সম্মান নিয়ে বাঁচতে হলে এমনটি করতেই হয়!"

আসলে সামাজিক রীতিনীতিকে আমরা এতটাই কঠিন করে ফেলছি যে, তা কখনো মানুষকে বাধ্য করছে, কখনোবা সমাজে ভুল বার্তা ছড়াচ্ছে। তাই কিছু মানুষ মন থেকে সেগুলো মেনে না নিলেও 'সমাজে থাকতে হলে এসব করেই থাকতে হবে' এমন একটা বদ্ধমূল ধারণা জন্মে গেছে। এই ধারণাটিকে আমাদের বদলাতে হবে। আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (সা) বলেছেন, "বিয়ের অনুষ্ঠানের মধ্যে সেই অনুষ্ঠানটি নিকৃষ্ট, যাতে ধনীদের দাওয়াত দেয়া হয় আর গরিবদের উপেক্ষা করা হয়।" (মিশকাত)

আমি গিফট দেয়া-নেয়ার বিরোধিতা করছি না। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "তোমরা পরস্পরের মধ্যে গিফট আদান-প্রদান করো। এতে তোমাদের সম্পর্ক গভীর হবে।" তবে বর্তমান কালের বিয়ের গিফট প্রদানের প্রথা দেখে মনে হচ্ছে মেহমানরা বাধ্য হয়েই গিফট নিয়ে আসছেন। এ যেন গিফটের বিনিময়ে খাদ্য! তাই বর্তমান সমাজের প্রেক্ষাপটে বলতেই হয়, বিয়ের এই বাজে প্রথা থেকে বেরিয়ে আসা উচিত। আত্মীয়দের মধ্যে কে বড়লোক, কে গরীব, এসব বাছবিচার না করে, কারো কাছ থেকে কিছু পাওয়ার আশা না করে সন্তুষ্ট চিত্তে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী দাওয়াত খাওয়াতে হবে। আর কারো যদি একান্তই গিফট দিতে ইচ্ছা করে বা কেউ নাছোড়বান্দা হয়ে গিফট দিতে চাইলে নবদম্পতির হাতে গিফট দেয়াটাই উত্তম।

www.pathagar.com

বৈবাহিক বিষন্নতা

দুই বছর আগের কথা। একটা ভর্তি পরীক্ষা দিতে গিয়েছি। পরীক্ষা কেন্দ্রের গেট তখনও খুলেনি। সময় কাটানোর জন্য পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একজন মেয়ের সাথে কথা বলা শুরু করলাম। এক পর্যায়ে পরিবার নিয়ে কথা উঠলো। বললাম, "আমি সিঙ্গেল। আপনি?" কিছুটা বিষন্নতা মনে তিনি বললেন, "হুম। সিঙ্গেল থাকাই ভালো। আমি মেরিড।"

যাই হোক, উনার মতো অনেককেই দেখেছি, বিবাহিত হয়ে বৈবাহিক জীবনকে ভালো বলেন না। অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে অবিবাহিতদেরকে পরোক্ষভাবে বিয়ের ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করেন। বিবাহিত হয়েও আমাদের অনেকের মধ্যে বিষন্নতা-হতাশা কাজ করে বিভিন্ন কারণে:

১। আমরা ভুলটা করি বিয়ের আগেই। মা-বাবা হোক বা নিজেই, জীবনসঙ্গী পছন্দ করি ছেলের বাহ্যিক হাবভাব, টাকা-পয়সা ইত্যাদি দেখে। অথচ, ধার্মিকতা ও উন্নত মানসিকতা, যে দুটো গুণ একজন পুরুষকে স্ত্রীর অধিকারের ব্যাপারে সচেতন করে, তা আছে কিনা, সেটি নিয়ে আমরা খুব একটা ভাবি না।

২। জীবনসঙ্গীর সাথে আমার প্রতিটি পদক্ষেপের মিল থাকবে – এমন একটা ধারণার মধ্যে আমরা ডুবে থাকি। ফলে কোনো ক্ষেত্রে অমিল হলেই মনে করি, 'আমি অসুখী, আমি নির্যাতিত'!

৩। সংসার হচ্ছে একজন মানুষের জন্য ওপেন চ্যালেঞ্জ। যা মোকাবেলায় অনেকেই ব্যর্থ হয়ে যায়। এর কারণ হলো অধৈর্য, সমঝোতার অভাব ও নিজেকে অদৃশ্য প্ররোচণায় নিমজ্জিত করা। আমরা সবাই জানি, বিয়ে মানুষের দৃষ্টি সংযত করে, চরিত্র উন্নত করে, অশ্লীলতা ও পাপাচার করতে বিবেককে বাঁধা দেয়। এতগুলো অন্যায় যখন একটা বিয়ের মাধ্যমে বন্ধ হয়ে যায়, তখন মানুষের চিরশত্রু শয়তান ভিন্ন পথে এসে মানুষকে বিপথগামী করে, মনে অশান্তি সৃষ্টি করে, জীবন নিয়ে চাওয়া-পাওয়া সংক্রান্ত উদাসীনতার জন্ম দেয়। আমরা এটাও জানি, বৈবাহিক জীবনে ভাঙ্গন ধরাতে পারলে শয়তান সবচেয়ে বেশি খুশি হয়।

তাই অদৃশ্য শয়তানের এই ষড়যন্ত্রকে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে মোকাবেলা করা যায়–

১। অল্পে তুষ্ট থাকা। নিজের মধ্যে একটি কৃতজ্ঞ মনকে লালন করা।

www.pathagar.com

২। রাগ কিংবা ভালোবাসা, কোনোটাতেই সীমালঙ্ঘন না করা।

৩। এটা বিশ্বাস রাখতেই হবে, মানসিক বা শারীরিকভাবে মানুষের অবস্থান সব সময় এক রকম থাকে না। তাই কখনো কোনো বিষয়ে অপরপক্ষ থেকে কাঙ্খিত সাড়া না পেলে 'সে আমাকে অ্যাভয়েড করছে' হুট করেই এ জাতীয় ধারণা পোষণ করা উচিত নয়। ঠাণ্ডা মাথায় পরিস্থিতি বিবেচনা করতে হবে।

৪। কোনো বিষয়ে সন্দেহ জাগলে মনে চেপে না রেখে খোলামেলা আলোচনা করা উচিত।

৫। পাওয়া না-পাওয়া – সবক্ষেত্রেই আল্লাহর ওপর ভরসা রাখা দরকার। আল্লাহ আমাদের ভাগ্যে এই পৃথিবীর যেটুকু সুখ রেখেছেন, আমাদের কাছ থেকে কেউ তা ছিনিয়ে নিতে পারবে না, এই বিশ্বাস অটুট রাখতে হবে। '...মু'মিনদের আল্লাহর প্রতি নির্ভর করা উচিত' (সূরা ইমরান: ১৬০)।

এসব বিষয়কে যথাযথভাবে বিবেচনা করলে, আশা করা যায় বৈবাহিক জীবন নিয়ে আমাদের মধ্যে বিষন্নতা কাজ করবে না। যেকোনো পরিস্থিতি সামাল দেয়ার মতো বিচক্ষণতা থাকবে। সেই সাথে থাকবে জীবনের ছোট ছোট স্মৃতি পুঁজি করে আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্টি এবং সমাজের প্রতি ইতিবাচক বার্তা।

www.pathagar.com

এটা কি মানসিক রোগ?

কোনো কোনো মা নিজের ছেলেদের বিয়ে করাতে দেরি করেন। তাদের ধারণা, ছেলেকে বিয়ে দিয়ে দিলে সে আর ঘরের দিকে খেয়াল রাখবে না, বৌ এর হয়ে যাবে। তাই আরো কটা দিন যাক। তাঁরা ছেলের দিকটা চিন্তা করেন না। ছেলের বয়স ৩৫ হয়ে গেলেও আগের একই কথা। আবার কোনো কোনো মা – বিয়ের পরে ছেলে বউয়ের সান্নিধ্যে থাকবে, এটা পছন্দ করেন না। বউয়ের সাথে একটু বেশি সময় থাকলেও তাঁরা ধারণা করেন, ছেলে বুঝি তাকে অগ্রাহ্য করছে। যদিও বিষয়টা তেমন না।

এ ধরনের মনোভাব কোনো কোনো মা চেপে রাখলেও কেউ কেউ তা লুকাতে পারেন না। অনাকাঙ্খিত বহিঃপ্রকাশ ঘটান। পরিণতিতে সন্তানের বিয়ে পর্যন্ত ভেঙ্গে যায়। এ কথা শুনে হয়ত অনেকে অবাক হচ্ছেন। তাহলে একটা বাস্তব ঘটনা বলি:

চার কি পাঁচ মাস আগে পাশের বাড়ির ভাইয়ার কাবিন হলো। খবরটা শুনে বেশ খুশি হয়েছিলাম। কারণ উনার অনেক বয়স হয়ে গিয়েছিলো। উনার মা পুত্রবধূ খুঁজতে অতিরিক্ত বাছবিচার করতেন। যাই হোক, মেয়েপক্ষ কমিউনিটি সেন্টারে বিশাল আয়োজন করে কাবিনের আনুষ্ঠানিকতা করলো। ঠিক হলো, ঈদের পর বউকে শ্বশুর বাড়ি তুলে নিয়ে আসা হবে। দুদিন আগে হঠাৎ শুনি, বিয়ে নাকি ভেঙ্গে গেছে! 'ইন্নালিল্লাহ! কাহিনী কী? কী এমন ঘটলো'! ওই যে বললাম, কোনো কোনো মায়ের সমস্যা! এখানেও হয়েছে সে রকম।

কাবিন হয়ে যাওয়া মানেই তো বিয়ে। শুধু বউকে তুলে নেয়া বাকি। তাই বউয়ের সাথে দেখা করতে ছেলে প্রায়ই শ্বশুরবাড়ি যায়। মাঝে মধ্যে রাতে থেকেও আসে। কিন্তু বউয়ের সাথে দেখা করতে গেলেই ছেলের মা কেমন যেন সন্দেহ করে। ছেলেকে ফোনের পর ফোন করতে থাকে। যখনই ছেলে শ্বশুর বাড়ি যায়, তখনই এমন আচরণ। এ নিয়ে মা-ছেলের মধ্যে মনোমালিন্য চলতে থাকে। এক কথা, দুই কথার পর বাড়তে বাড়তে তা ঝগড়াঝাটির পর্যায়ে চলে যায়। অবশেষে বিয়েটা ভেঙ্গেই গেলো।

ভাবছিলাম সেই মেয়েটির কথা। না জানি কতো খারাপ লাগছে তার। মাত্র পাঁচ মাসের মাথায় বিয়ে ভেঙ্গে গেলো। মাত্র কয়েক মাস হলেও তা কতো না স্মৃতিমধুর ছিলো! আর হওয়াটাই তো স্বাভাবিক, যেহেতু তারা স্বামী-স্ত্রী। ভাইয়ার বিষয়টাও বুঝলাম না। তিনি কি একবারও সেই মেয়েটার কথা চিন্তা করলেন না? নাকি মায়ের আদেশের সামনে তার কোনো

www.pathagar.com

কথাই চললো না? কোনো মেয়ের একবার বিয়ে ভেঙ্গে গেলে পুনরায় বিয়ে হওয়াটা মুশকিল হয়ে যায়, সেই মেয়ে যতই ভালো থাকুক। এটাই হলো আমাদের সমাজের অবস্থা!

যাই হোক, এসব মা বোধ হয় মানসিক রোগী। আল্লাহ আমাদের এমন রোগ থেকে রক্ষা করুন।

www.pathagar.com

নবদম্পতিদের জন্য

যারা নতুন বিয়ে করেছেন, তাদের জন্য কিছু টিপস:

১। আপনি কেমন এটা বুঝানোর আগে, আপনার জীবনসঙ্গী কেমন সেটা বুঝার চেষ্টা করুন। নিজেরটা বলার আগে তারটা শুনুন। এতে আপনারই সুবিধা হবে।

২। তার কোনো ধারণা আপনার কাছে বিতর্কিত বা ভ্রান্ত মনে হলে হুট করে বিরূপ মন্তব্য করা বা তাকে ছোট করা থেকে বিরত থাকুন। সময় সুযোগ বুঝে নিজের মতামত প্রকাশ করুন। তবে হ্যাঁ, আপনার জীবনসঙ্গীর মতামত সঠিক হলে তা মেনে নেয়ার মানসিকতা গড়ে তুলুন। আশা করা যায় জীবন সহজ ও আনন্দময় হবে।

৩। সবার সামনে আপনার সঙ্গীর নিন্দা বা সমালোচনা এবং আরেকজনের সঙ্গীর প্রশংসা করবেন না। কারো কোনো ভালো গুণ আপনাকে প্রভাবিত করলে সেই গুণটি নিজের জীবনসঙ্গীর মধ্যে দেখতে চাইতেই পারেন। তবে এ ক্ষেত্রে ওই ব্যক্তির সাথে তুলনা করে নয়, বরং আপনার সঙ্গী যাতে নিজ থেকেই সেই গুণে গুণান্বিত হয়, সেই পথে তাকে উদ্বুদ্ধ করুন।

৪। শারীরিক কোনো বিষয় নিয়ে জীবনসঙ্গীকে খোঁটা দিবেন না। যেহেতু বিয়ের আগে তাকে দেখেই আপনি বিয়ে করেছেন। তাছাড়া প্রত্যেক নারী-পুরুষের উচিত, গোপন কোনো রোগ থাকলে বিয়ের আগে তা লুকানোর পরিবর্তে বলে ফেলা। যার সাথে বিয়ে হওয়ার এমনিতেই হবে।

৫। আপনার স্বামী সারপ্রাইজ হিসাবে কোনো গিফট আনলে, তা পছন্দ না হলেও হাসিমুখে তাকে ধন্যবাদ জানান। কারণ, তিনি আপনার জন্যই এই কষ্টটা করেছেন। এর মূল্যায়ন করুন। একই কথা স্বামীর ক্ষেত্রেও।

৬। আপনার স্ত্রী বাসায় আপনার জন্য কখনো সাজলে তার প্রশংসা করুন। তাকে সুন্দর না লাগলেও প্রশংসা করুন। "কি দরকার ছিলো? শুধু শুধু সময় নষ্ট। আসলে তোমাদের কোনো কাজ থাকে না তো ..." – এসব অহেতুক কথা না বলাই শ্রেয়। কারণ তিনি সারাদিনের কাজ সেরে মূল্যবান সময় বের করে শুধু আপনার জন্যই সেজেছে। তাই নিজের ধারালো কথায় তার মন ভেঙ্গে দেবেন না। এর মাধ্যমে নিজেকেই ছোট করা হয়। বরং আপনার স্ত্রী যাতে শুধু আপনার জন্যই সাজে, সে জন্য তাকে উৎসাহিত করুন।

www.pathagar.com

৭। পথে ঘাটে, চলতে ফিরতে, অফিসে, কোনো প্রতিষ্ঠানে বা পত্রিকার পাতায় কোনো পুরুষ বা নারীর গেটআপ আপনার পছন্দ হলে, সেদিকে তাকিয়ে না থেকে নিজের স্ত্রীর জন্য তেমন পোশাক বা সামগ্রী কিনে দিন কিংবা নিজের স্বামীকে তেমনভাবে সাজতে বলুন। এতে আপনি বৈধ পন্থায় বৈধ ব্যক্তির প্রতি আকৃষ্ট হতে পারবেন। নিজের পছন্দ বা রুচি জীবনসঙ্গীর মধ্যে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করুন।

৮। জীবনসঙ্গীকে রাগের বশেও এমন কথা বলবেন না, যে কথা তিনি আপনাকে বললে আপনারও খারাপ লাগবে।

৯। কর্তৃত্বপরায়ণতার পরিবর্তে নিজের মধ্যে দায়িত্বশীলতা গড়ে তুলুন। মনে রাখবেন, দায়িত্বশীলতা আসে ভালোবাসা থেকে। আপনারা পরস্পরকে ভালোবাসেন, এটা একে অপরের কাছে প্রকাশ করুন। আপনার জীবনসঙ্গীর মধ্যে তখনই দায়িত্বশীলতা আসবে যখন সে বুঝবে আপনি তাকে ভালোবাসেন।

১০। বিয়ে মানে শুধুই শারীরিক সম্পর্ক নয়। এর সাথে মানসিক সম্পর্কও জড়িয়ে আছে। তাই আগে এই সম্পর্কটা সুষ্ঠু ও মজবুত করার চেষ্টা করুন।

www.pathagar.com

আমরা যারা ফ্রি মাইন্ডেড

বৈবাহিক সূত্রে তৈরি হওয়া কিছু সম্পর্ক বা সম্পর্ক বহির্ভূত কিছু পরিচয় থাকে যে ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করে চলতে হয়। ব্যক্তিজীবনের ওপর যেন বিরূপ প্রভাব না পড়ে, সে জন্য ক্ষেত্রবিশেষে তা এড়িয়ে চলা লাগে।

সম্পর্কগুলো নিয়ে আলোচনা পরে করছি। তার আগে সম্পর্ক বহির্ভূত পরিচয়গুলো নিয়ে বলি। সাধারণত দুই ধরনের পরিচয় থাকতে পারে:

১। বিয়ের আগে আপনার কাউকে ভালো লেগেছিলো এমন
২। পাত্র/পাত্রী খুঁজতে গিয়ে যেসব প্রস্তাব আপনার কাছে এসেছিলো

অবিবাহিত অবস্থায় মনটা অনেকভাবেই বিচলিত হয়। ধরে নিলাম, বিয়ের আগে কাউকে আপনার ভালো লেগেছিলো। তবে কোনো এক কারণে তিনি আপনার জীবনসঙ্গী হতে পারেননি। সেই অতীত ভুলে আপনি এখন বিয়ে করেছেন। যেহেতু সেই ছেলে/মেয়েটির সাথে আপনার সম্পর্ক গড়ায়নি, তাই জীবনসঙ্গীর সাথে তার ব্যাপারে কোনো আলোচনা করবেন না। এমনকি সেই অতীতের ব্যক্তির সাথে দেখা হয়ে গেলেও অন্তরঙ্গতা তৈরি করা উচিত নয়। যদি কর্মস্থল বা কোনো মিটিংয়ে দেখা যায়, সেক্ষেত্রেও প্রয়োজন ছাড়া কথা না বলাই শ্রেয়। কারণ, শয়তান শুধু বিয়ের আগে নয়, পরেও মনটাকে বিচলিত করে তুলতে পারে। তাই মনকে পবিত্র রাখুন।

তাছাড়া বিয়ের আগে ঘটকের মাধ্যমে যেসব প্রস্তাব এসেছিলো, তাদের মধ্যে আপনি যাদের বাদ দিয়েছিলেন কিংবা আপনাকে যারা বাদ দিয়েছিলো – তাদের প্রভাব যেন আপনার এখনকার বৈবাহিক জীবনে না পড়ে, সে জন্য দুয়া করুন। বিয়ের পর তাদের কারো সাথে দেখা হয়ে গেলেও আগ বাড়িয়ে কথাবার্তা বলা বা তাদের পরিবারের সাথে ঘনিষ্ট হওয়া বিচক্ষণতার কাজ নয়। এতে করে শয়তান প্ররোচনা দেয়ার সুযোগ পেয়ে যাবে। দুপক্ষই নিজেকে অন্যজনের জীবনসঙ্গীর সাথে তুলনা করার প্রবণতা তৈরি হতে পারে। এর মাধ্যমে হিংসা, আফসোস বা হতাশা তৈরি হবে। পরিণতিতে উভয়ের সাজানো সংসার ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।

এবার বৈবাহিক সূত্রে তৈরি হওয়া সম্পর্কগুলো নিয়ে বলা যাক। অর্থাৎ, দেবর, শালী, বেয়াই, বেয়াইন – এ জাতীয় সম্পর্কগুলোর মধ্যে একটা নির্দিষ্ট সীমা বজায় রাখা উচিত।

www.pathagar.com

অনেকে বেয়াই-বেয়াইনদের সাথে ঠাট্টা মশকরাকে এমন পর্যায়ে নিয়ে যান, যাকে সীমা অতিক্রম বললে ভুল হবে না। অনেকে এটাকে জায়েজ মনে করেন!

আফসোস! আমরা অনেকেই এই বিষয়গুলো বুঝি না। আর না বুঝার কারণে, বিশেষত সম্পর্ক বহির্ভূত পরিচয়গুলোর ক্ষেত্রে আগ বাড়িয়ে কথা বলতে যাই। ধারণাটা এমন, "বিয়ে হয়নি তো কী হয়েছে? ফ্রি মাইন্ড নিয়ে থাকো, এতো গোঁড়ামি করার কী আছে?" যদিও বেশি ফ্রি মাইন্ডেড হওয়া ভালো না...।

www.pathagar.com

আমি যেমন সেও তেমন

একই কাজ আমিও করছি, আমার সঙ্গীও করছে। তবে আমি তারটাকে ভালো দৃষ্টিতে দেখছি না। অথচ সেই কাজটি নিজে করলে বলছি, "ও কিছু নয়"! এমন নীতি আসলে ঠিক নয়। অথচ এ ধরনের মনোভাব অনেক স্বামীর মধ্যেই দেখা যায়। ফলে সংসারে শুরু হয় অশান্তি ও সন্দেহ। এর প্রভাব শুধু স্বামী-স্ত্রীর জীবনেই পড়ে না, সন্তানের ওপরও বিরূপ প্রভাব ফেলে। উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি পরিষ্কার করি।

দুঃসম্পর্কের এক বিবাহিত ভাই তার বন্ধুর দাওয়াত পেয়ে বন্ধুর পরিবারের সাথে রেস্টুরেন্টে খেতে যান। তিনি যে রেস্টুরেন্টে খেতে যাচ্ছেন, এ ব্যাপারে স্ত্রীকে কিছুই জানাননি। যাই হোক, রেস্টুরেন্টে খাবারের মধ্যেই শুরু হলো সেলফি তোলা। বন্ধুর ভাগ্নী সেলফি তুলছেন। সেই ভাইটিও তার সাথে বেশ মজা করে ছবি তুললেন।

হ্যাঁ, আজকাল অনেকের মধ্যেই সেলফি ম্যানিয়া (উন্মাদনা) কাজ করছে। উঠতে, বসতে, খেতে, সবকাজে সেলফি তোলার উন্মাদনা চলছে। স্মৃতি ধরে রাখার নামে শালীনতার মানদণ্ড অতিক্রম করেই যে কাউকে 'সেলফি সঙ্গী' বানিয়ে নেয়া হচ্ছে। বাদ পড়ছে না বিপরীত লিঙ্গের সহপাঠী কিংবা অফিসের ম্যানেজারও। বিভিন্ন উপলক্ষ্যে অনেক সময় একসাথে ছবি তোলা হয়ে যায়, এটা সত্য। তবে শালীনতা বজায় রেখে ছবি তোলা আর গায়ে গা লাগিয়ে অন্তরঙ্গ ছবি তোলার মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য আছে। প্রায় সময় ছেলে-মেয়ে কেউই এসব বাছবিচার করছে না। অতিরিক্ত ফ্রি মাইন্ড দেখিয়ে নিজেকে অন্যের সামনে সস্তা করে ফেলা হচ্ছে।

তো, যা বলছিলাম। এদিকে বন্ধুর ভাগ্নী ও সেই ভাইয়ের একসাথে তোলা ছবি ফেসবুকে আপলোড করা হলে তা ভাইটির স্ত্রীর নজরে পড়ে। ছবি দেখে তো স্ত্রী অবাক! তার স্বামী আরেক মেয়ের সাথে কীভাবে এমন ছবি তুললেন! আর রেস্টুরেন্টেই বা কবে গেলেন? বলেনও তো নাই!

কথাটা সেটাই। হ্যাঁ, সব জায়গায় স্ত্রীকে নিয়ে যাওয়া যায় না, বিশেষ করে কেউ একলা দাওয়াত দিলে। তবে দাওয়াতের কথা স্ত্রীকে জানানো দরকার ছিলো। আর যেখানেই যান না কেনো নিজের মানসম্মান বজায় রেখে চলা উচিত ছিলো। আজ বন্ধুর ভাগ্নীর সাথে তিনি যেভাবে ছবি তুলেছেন, সেই একই কাজ যদি তার স্ত্রী করতেন, তাহলে কি তিনি তা মেনে নিতেন? কখনোই না।

www.pathagar.com

সুতরাং, যে কাজ অন্যে করলে দৃষ্টিকটু লাগে, নিজেও তা করা উচিত নয়। কু'রআনের সূরা নূরের ২৬ নং আয়াতটি সবসময় মনে রাখা উচিত, যেখানে 'চরিত্রবান নারী, চরিত্রবান পুরুষের জন্য' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব, আমরা ভালো হলে ইনশাআল্লাহ আমাদের সঙ্গীও ভালো হবে।

www.pathagar.com

আমার বউ কালো

মেয়েদের বেলায় 'সুন্দরী' শব্দটা যেমন ব্যবহৃত হয়, ছেলেদের বেলায় 'কর্মঠ', 'সুঠামদেহী' শব্দগুলো তেমন বেশি ব্যবহৃত হয়। তাই বলে ছেলেদের সৌন্দর্য (শরীরের রঙ) যে দেখা হয় না, তা নয়। ফর্সা ছেলে দেখলে মেয়েরা যেমন পাগল হয়ে যায়, মেয়ের পরিবারও ছেলেকে জামাই বানানোর জন্য তেমন মুখিয়ে থাকে। তবে বিয়ের পর যখন ফর্সা জামাই ও শ্যামলা বউকে লোকজন একসাথে দেখে, তখনই সমস্যার শুরু হয়।

ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলি। সমাজে প্রতিষ্ঠিত ধারণা হচ্ছে, বর যেমনই হোক, কনে হবে ফর্সা। ফলে সবাই আগ্রহ নিয়ে বউ দেখে বলবে, 'বাহ! কি সুন্দর!' বরকে চিমটি কেটে বলবে, 'হুম, তুমি ভাগ্যবান।' জামাই বাবুও বউয়ের রূপের সুনাম শুনে আনন্দে মাতোয়ারা – "যাক! পাইছি সুন্দরী বউ!"

আচ্ছা, যদি বিপরীত পরিস্থিতি হয়, তখন? ধরুন, কোনো অনুষ্ঠানে বা কোথাও ফর্সা স্বামী এবং শ্যামলা স্ত্রী গেলো। শুরু হয়ে যাবে লোকজনের বিরূপ মন্তব্য – "হায় আল্লাহ! অমুকের বউ তো দেখছি কালো!" "এত দেখে শেষে এই মেয়েকে পছন্দ করলো?" "হুম, ভাগ্যবতী মেয়ে, এমন ছেলে পাইছে।"

এসব কথা শুনে মেয়েটার যেমন খারাপ লাগে, তেমনি স্বামীর মনেও কষ্ট লাগে। সেই কষ্টটা স্বামী হয়ত স্ত্রীকে বুঝতে দিতে চান না। এসব কটু কথাই অনেক সময় পরোক্ষভাবে স্ত্রীকে অতিরিক্ত রূপচর্চা করতে উদ্বুদ্ধ করে। স্বভাবতই সেই মেয়েটা তখন নিজেকে কীভাবে সাজানো যায়, সবার সামনে নিজেকে কীভাবে প্রদর্শন করা যায়, লোকে যেন বলে অমুকের বউ খুব সুন্দর – এসব ভাবনায় মশগুল থাকে। ফলে এই পরিস্থিতি অনেক সময় নৈতিকতার মানদণ্ড লংঘন করে, নিজের রূপ সম্পর্কে অহংকারী মনোভাব তৈরি হয়। ফলে মেয়েটি গুণের বিকাশ ঘটানোর পরিবর্তে রূপ নিয়েই শুধু চিন্তা করে। অবশেষে, সৌন্দর্য মানেই গায়ের ফর্সা রং – সমাজে বিদ্যমান এই একপেশে ধারণাটির পরিবর্তন আর হয় না।

যাই হোক, এ প্রসঙ্গটি তুললাম এ কারণে যে, ছেলে পছন্দ করার সময়ও শুধু সৌন্দর্য দেখা উচিত নয়। তবে হ্যাঁ, কে কার ভাগ্যে আছে তা বলা যায় না। ফর্সা ছেলের সাথে কালো মেয়ের বিয়ে হতেই পারে। তবে তেমন মানসিকতার ছেলের সাথে মেয়ের বিয়ে দেয়া উচিত, যে কিনা বলবে, 'আমার বউ কালো, তবে মনটা তার ভালো'।

www.pathagar.com

এমন দৃষ্টান্ত হয়ত বিরল

পুরুষদের মধ্যে ধৈর্যশীলতার নজীর খুব একটা দেখা যায় না। অথবা, তাদের ধৈর্যশীলতার ব্যাপারটা সম্ভবত আড়ালেই থেকে যায়। সমাজে সাধারণত নারীদেরকেই ধৈর্যশীল হিসেবে মনে করা হয়। তবে একজন ভাইয়ের বাস্তব একটা ঘটনা বলি। এই ভাইয়ের পরিবর্তে অন্য কেউ হলে হয়ত ঘটনাটা ভিন্নভাবেই লেখতে হতো।

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার উপজেলায় এই দম্পতির বসবাস। প্রায় বছর দশেক আগে তাদের বিয়ে হয়। অনুষ্ঠান করে বউকে স্বামীর বাড়িতে তুলে আনা হয়েছে। এদিকে মেয়েপক্ষ যে এক বিরাট কথা গোপন রেখেছে তা বিয়ের রাতে আবিষ্কৃত হয়। ছেলে তো অবাক, একি! বউ তো চোখে দেখে না! এতো বড় কথা গোপন করা হলো! অন্য কোনো ছেলে হলে বোধ হয় মেয়েপক্ষের এই মারাত্মক অপরাধের উচিত শিক্ষা দিয়েছে ছাড়তো। কিন্তু এই ভদ্রলোক তা করেননি। তার বক্তব্য হলো, 'মেয়ের মা-বাবা কাজটি ঠিক করেননি। তবে আল্লাহকে সাক্ষী রেখে যখন এই মেয়েকে কবুল করে নিয়েছি, তখন এর দায়িত্ব আমার।' পরবর্তীতে তিনি নিজের সাধ্যমত চিকিৎসা করিয়ে স্ত্রীর চোখ ঠিক করার চেষ্টা করলেন।

উল্লেখ্য, মহিলার চোখের সমস্যাটা জন্মগত। দিনে সূর্যের আলোতে ঝাপসা দেখলেও রাতে দেখতে পান না। বিয়ের পরে স্বামী তার চিকিৎসা করানোর পর কিছুটা উন্নতি হলেও আবার সেই আগের অবস্থা। এতকিছুর পরও ভদ্রলোককে তার স্ত্রীর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, "বউ আমার অনেক ভালো। সব কাজ নিজ হাতে করে। আমি বলি না, তারপরও এই চোখ নিয়ে রান্নাও করে। তার রান্না অনেক মজার!"

এমন সন্তুষ্টপূর্ণ মন, স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা ও অভিযোগহীন মানসিকতাসম্পন্ন ভাইয়ের প্রতি অনেক সালাম।

www.pathagar.com

আধিপত্য বিস্তার: শাশুড়ি বনাম বউ

এটা বলার অপেক্ষা রাখে না, আমাদের সমাজে 'শাশুড়ি' একটি নেতিবাচক শব্দে পরিণত হয়েছে কিংবা নেতিবাচক করে দেয়া হয়েছে। তাই 'নারী অধিকার' শব্দটি আমরা ব্যবহার করি বটে, কিন্তু সমাজে 'শাশুড়ি' চরিত্রে যিনি বসে থাকেন, তিনি যেন 'অধিকারের তালিকা'র বাইরের কেউ!

আমি মনে করি, 'অধিকার' মানে নির্দিষ্ট কোনো জাতি, গোষ্ঠী বা মানুষকে শুধু প্রাপ্যতা বুঝিয়ে দেয়াই নয়, বরং সমাজের প্রতি দায়িত্বটুকুও বুঝিয়ে দেয়া আমাদের কর্তব্য। সেই হিসাবে পরিবারে শাশুড়ির কী করণীয় এবং শাশুড়ির প্রতি বউয়ের কী দায়িত্ব, সর্বোপরি 'শাশুড়ির অধিকার' নিয়ে কাউকে কিছু বলতে দেখা যায় না। আমাদের এই অসচেতনতার কারণে কখনো শাশুড়িরা আক্রমণাত্মক হয়ে উঠেন, সংসারে একক কর্তৃত্ব স্থাপনের চেষ্টা করেন; আবার কখনো মানসিকভাবে নির্যাতিত বা অবহেলিত হয়ে পড়েন। তাই শাশুড়ি ও বউয়ের অধিকার ও আচরণ নিয়ে একতরফা আলোচনার পরিবর্তে উভয় দিকই এই নিবন্ধে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

অধিকাংশ শাশুড়ি একটা সাধারণ ভুল করে থাকেন। তাদের কথা হলো, "আমি এখনো জীবিত আছি, তাই আমার সংসার আমার মতো করেই চলবে।" এই দৃষ্টিভঙ্গির ফলে পুত্রবধূকে বিভিন্ন কাজ সামলানোর দায়িত্ব দিয়ে তিনি আশা করেন, কাজটি তিনি যেভাবে করেন, পুত্রবধূকেও ঠিক সেভাবেই করতে হবে। এই মনোভাব মারাত্মক একটা সমস্যা সৃষ্টি করে। কারণ, একজনের লাইফস্টাইল ও কাজের ধরনের সাথে আরেকজনের পুরোপুরি মিল না থাকাই স্বাভাবিক। পরিবার টিকে থাকে সমঝোতার ওপর। আপনি যদি মানুষকে স্বাধীনতা দেন, তাহলে দেখবেন ব্যক্তি সন্তুষ্টচিত্তেই অর্পিত দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।

ধরে নিই, কারো কাজের ধরনে আপনার সমস্যা আছে। কিংবা মনে করি, শাশুড়ি খুব পরিপাটি টাইপ মানুষ, কিন্তু পুত্রবধূ কিছুটা অগোছালো। রান্না ঘরে গেলে সব এলোমেলো করে দিয়ে আসে। ঘরে কাপড়-চোপড় যেখানে সেখানে পড়ে থাকে। ঝুটা চায়ের কাপ সেই কবে থেকে টেবিলে পড়ে আছে ইত্যাদি ইত্যাদি। এই ব্যাপারগুলো স্বভাবতই শাশুড়ির চোখে দৃষ্টিকটু লাগে। এ পরিস্থিতিতে শাশুড়ি যদি বুদ্ধিমত্তার সাথে হাসিমুখে বলে, 'ঘরটা গুছিয়ে রাখলে তো লোকে তোমাকেই ভালো বলবে...'। বা শাশুড়ি একটু মজা করে

www.pathagar.com

ব্যাপারটা বলতে পারেন, অপরপক্ষ যেন কথাটিকে গুরুত্ব দেয়। আন্তরিক কথাবার্তার মধ্যে একটি ম্যাসেজ দিয়ে দিলে মানুষের মগজে তা গেঁথে যায়।

যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা দেখি, মানুষ বড়ই ঝগড়াটে। তারা অন্যকে শেখাতে গিয়েও ভালো কৌশল খাটাতে ব্যর্থ হয়। হুট করে বলে ফেলে, "মায়ের বাসা থেকে কিছু শেখোনি?" হতে পারে আসলেই কিছু শেখায়নি। সে জন্যই তো এমন! "দেখো বউ, নিজের বাড়িতে যা করে এসেছো, আমার এখানে ওসব চলবে না। যেভাবে বলি সেভাবে করো" এ জাতীয় কথাগুলো স্বভাবতই যে কোনো মানুষের কাছে কানের মধ্যে পিনের খোঁচার মতো মনে হবে। তাছাড়া ঝি'কে মেরে বউকে শেখানো কিংবা সবসময় অন্য কোনো ব্যক্তির সাথে তুলনা করা- এগুলো অভ্যাসও খারাপ। ফলে এক পর্যায়ে নিউটনের তৃতীয় সূত্রের প্রয়োগ শুরু হয়। বউয়ের মনে তখন প্রশ্ন জাগে, "আমাকে এতো কথা শোনাবে কেনো? আমি বাড়ির বউ নাকি কাজের বুয়া? সবসময় 'তার সংসার', 'তার সংসার' করে কেনো? এটা কি আমার সংসার নয়? আমার কোনো কথাই কি এখানে চলবে না?" স্বামীর কানেও এক পর্যায়ে কথাগুলো পৌঁছে। তবে স্বামীর জন্য পরিস্থিতিটা আরো জটিল হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, সমঝোতার মানসিকতা কোনো পক্ষেরই থাকে না। কোনো কথা বা সিদ্ধান্ত বউয়ের সমর্থনে চলে গেলে মা বলে উঠেন, "আজকে বউ এর জন্য তুই আমাকে এই কথা শুনাচ্ছিস!" আবার কোনো কথা মায়ের সমর্থনে গেলে বউ বলে, "আপনার জীবনে আমার কোনো গুরুত্বই নাই, তাহলে বিয়ে করলেন কেনো?" পুরোই কুল রাখি না শ্যাম রাখি অবস্থা। এভাবে জটিলতার শুরু হয় এবং সাংসারিক সুখের সমাপ্তি ঘটে।

বউ হিসেবে ঘরটাকে নিজের মতো করে সাজানোর স্বপ্ন থাকা মেয়েদের জন্য স্বাভাবিক। আর এ ব্যাপারে যদি স্বামীর কোনো আপত্তি না থাকে এবং তিনি যদি স্ত্রীর আইডিয়াগুলো পছন্দ করেন তাহলে তো অন্যের, বিশেষ করে শাশুড়ির, নাক গলানো পছন্দ করা যায় না। অথচ অনেক শাশুড়িই আছেন যারা খুঁটিনাটি ব্যাপারেও নিজের মতের প্রাধান্য ছাড়তে চান না, "সোফা ওভাবে রাখো, পিলো এভাবে রাখো, ওই ওয়ালমেট ভালো না, এই চাদরটা বিছাও" ইত্যাদি ইত্যাদি।

বয়সের কারণে শাশুড়ি অভিজ্ঞ হলেও সবসময় নিজের সিদ্ধান্তই যে অন্যের চেয়ে উত্তম হবে, এমনটি ভাবা উচিত নয়। বরং অন্যের মতামতকে গুরুত্ব দেয়ার মানসিকতা আমাদের মধ্যে তৈরি করা উচিত। ভালো মনে হলে সেটা মেনে নিতে কার্পণ্য করা ঠিক নয়। এতে অন্যেরা উৎসাহিত হবে। তবে হ্যাঁ, একান্তই কোনো ব্যাপারকে শাশুড়ি যদি সঠিক মনে না করেন বা তাঁর কাছে আরো ভালো কোনো বিকল্প থাকে, তাহলে তিনি এভাবে বলতে পারেন, "আমার মনে হয় এভাবে না করে ওভাবে করলে ভালো হবে।" সেক্ষেত্রে বউ কথা রাখলে রাখলো, না রাখলে নাই। আমরা তো কাউকে নিজের মতের ওপর বাধ্য করতে পারি না।

www.pathagar.com

তারপরও যদি দেখা যায়, পুত্রবধূর কোনোকিছুই শাশুড়ি মেনে নিতে পারছেন না, তাহলে ঝগড়াঝাটি না করে সন্তুষ্ট চিত্তে আলাদা হয়ে যাওয়া উত্তম। আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখা ও মনোমালিন্য সৃষ্টি না করার দিকে আমাদেরকে সবসময় মনোযোগী থাকতে হবে। আমরা যখন কারো সুবিধা করে দিবো, ইনশাআল্লাহ আমরাও তখন অনেক সুবিধা পেয়ে যাবো।

হ্যাঁ, বউ নিয়ে আলাদা থাকাটা অনেক পরিবার মেনে নিতে পারেন না বা ভালো চোখে দেখেন না। এর কারণ হলো, আমাদের সমাজে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বউ-শাশুড়ির ঝগড়ার কারণে আলাদা হওয়ার ঘটনা ঘটে। তাই দেখা যায়, আলাদা হওয়ার পর ছেলে আর মায়ের খোঁজ রাখে না। আবার অনেক পরিবারে দেখা যায়, ছেলের বউ, শাশুড়ির কথা শুনছে না বা তাঁকে সম্মান করছে না। কিংবা পুত্রবধূও শাশুড়ির সব কথা মেনে নিতে পারছে না, অসুবিধা হতেই পারে। এমন পরিস্থিতিতেও দেখা যায়, বিশেষত শাশুড়ি ঐতিহ্যের জেদ ধরে সংসার আলাদা করতে চান না।

বলে রাখা দরকার, সংসার আলাদা হওয়ার নানান রকমফের আছে। এসবের জটিলতাগুলোও ভিন্ন ভিন্ন। যেমন:

১। ছেলে শহরে কাজ করে বা বিভিন্ন জায়গায় বদলি হতে হয়, তাই তাকে বউ নিয়ে আলাদা থাকতেই হয়। এটা মেনে নিতে মায়ের সমস্যা হওয়ার কথা নয়। কারণ, স্বামী-স্ত্রীর আলাদা বসবাস করা ঠিক নয়। সেটা প্রবাস জীবনে হোক বা গ্রাম-শহর ব্যবধানে হোক।

তবে এই ব্যাপারটা অনেকেই বুঝতে চান না। অনেক মা-বাবার যুক্তি থাকে, "আমাকে দেখবে কে? ঘরের কাজ করবে কে?" ইত্যাদি। এ ব্যাপারে বলতে হয়, মা-বাবার দেখাশোনার ব্যবস্থা করা ছেলের দায়িত্ব। একান্ত কেউ না থাকলে নিজের কাছে মা-বাবাকে রাখা উচিত। সংসারের সবার কাজ করার জন্য একটা মেয়েকে বিয়ে করা হয় না। একজন মানুষ মূলত নিজের কাজ করার ব্যাপারেই মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকে। তাই সে নিজের কাজ যেন নিজেই করে, সে জন্যই মূলত সচেতন করা যায়। কিন্তু তার ওপর জোর করে কারো দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়া উচিত নয়। নিজে থেকেই সন্তুষ্টচিত্তে করে দিলে অবশ্য তা আলাদা ব্যাপার। কিন্তু 'বউ এনেছি কাজ করানোর জন্য' এমন মানসিকতা শ্বশুর, শাশুড়ি, স্বামী কিংবা পরিবারের কারো মধ্যেই থাকা উচিত নয়। মা-বাবা বৃদ্ধ বয়সে পদার্পণ করবেন এটাই স্বাভাবিক। বেঁচে থাকলে আমরাও একদিন বৃদ্ধ হবো। কিন্তু তাই বলে আমাদের সব কাজ পুত্রবধূকে দিয়ে করাবো, এটা তো হয় না। নিজের ফুট-ফরমায়েশের জন্য আমরা প্রয়োজনে কাজের মেয়ে রাখতে পারি। তাছাড়া বৃদ্ধ বয়সে মানুষ সময় কাটানোর জন্য একটা কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকতে চায়। সেক্ষেত্রে সন্তানের উচিত মা-বাবার জন্য তেমন ব্যবস্থা করা। হতে পারে তাদেরকে তাদের পছন্দ মতো বই কিনে দেয়া বা ভিন্ন কিছু, যা তারা ভালো মনে করেন।

www.pathagar.com

অন্যদিকে, আরেকটা বাস্তবতার কথা বলে রাখি। আমাদের মধ্যে এমনও কিছু মেয়ে আছেন, যারা বাইরে জব করেন বা হয়ত সারাদিন ঘরেই থাকেন; কিন্তু তারা শ্বশুড়-শাশুড়ির সাথে একটু গল্প করার সময় পর্যন্ত বের করেন না। এমনকি 'কেমন আছেন' পর্যন্ত জিজ্ঞেস করার প্রয়োজনবোধ করেন না। এটি ন্যূনতম শিষ্ঠাচার বহির্ভূত কাজ। সবার কাজ করার জন্য বউ আসে না – এটা ঠিক। তাই বলে শাশুড়ি কোনোদিন একটু রুটি বানিয়ে দেয়ার কথা বললেও যদি পুত্রবধূ বলে উঠেন, "আমি সবার কাজ করতে আসিনি", তাহলে তা শিষ্টাচারহীনতা। এমন কথাটা বলা যেমন সমীচীন নয়, তেমনি সবসময় বউকে কাজের ওপর রাখার মানসিকতা থাকাও সঠিক নয়।

২। অধিকাংশ যৌথ পরিবারে রান্না ঘরের ব্যবস্থাপনা নিয়েই মূলত ঝগড়া লাগে। সেক্ষেত্রে একসাথে থেকে 'রান্না ঘর' আলাদা করে দিলেও হয়। এটা করলে শাশুড়িকে কষ্ট করে রান্না করতে হয় না। আর দুটো মানুষের (শ্বশুর-শাশুড়ি) জন্য করতে নিশ্চয়ই বউয়ের সমস্যা হওয়ার কথা নয়।

৩। বউ-শাশুড়ি একে-অপরকে কিছুতেই মানিয়ে নিতে না পারলে পুরোপুরি আলাদা হয়ে যাওয়া ভালো। আলাদা বাড়ি, আলাদা সবকিছু। তবে এক্ষেত্রে শাশুড়ি অর্থাৎ ছেলের মা ছেলেকে কাছে না পেয়ে অনেক কষ্ট পান। এ বিষয়টা পুত্রবধূরও বুঝা উচিত। একসাথে থাকতে না পারলেও নিজে আগ্রহী হয়ে পারস্পারিক ঝগড়াটা মিটিয়ে নেয়ার চেষ্টা করতে পারেন। এক্ষেত্রে শাশুড়িরও আন্তরিকতার প্রয়োজন, যাতে একটা সুন্দর সম্পর্ক থাকে। আর ছেলের উচিত নিয়মিত মায়ের খোঁজ-খবর নেয়া, মায়ের সাথে সাক্ষাত করে তাঁর যাবতীয় প্রয়োজন পূর্ণ করা। মায়ের কোনো কষ্টের জন্য যাতে পরকালে জবাবদিহি করতে না হয়।

www.pathagar.com

তালাক: স্বাধীনতা নাকি স্বেচ্ছাচারিতা?

আমরা প্রায়ই শোবিজের অভিনেত্রী, মডেল কিংবা গায়ক দম্পতির বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনা শুনি। যেমন– মিডিয়া অঙ্গনে পরিচিত মুখ নাদিয়া-শিমুল এবং হৃদয়-সুজানা জুটির বিচ্ছেদের খবর কয়েকদিনের ব্যবধানেই পত্রিকায় এসেছিলো। তারা সেলিব্রেটি বিধায় মিডিয়া মারফত আমরা জানতে পেরেছি। কিন্তু বাস্তবেই বিবাহ বিচ্ছেদ তথা তালাকের প্রবণতা বাড়ছে। একটি জরিপ থেকে জানা গেছে, অন্যান্য বিভাগের চেয়ে রাজধানী ঢাকায় তালাকের হার বেশি।

ঢাকা সিটি করপোরেশনের তথ্য মতে, পরিবার ভাঙ্গনের হার দিন দিন বাড়ছে। তালাক নেয়ার ক্ষেত্রে মহিলারা এগিয়ে। নভেম্বর ২০০৯ থেকে নভেম্বর ২০১০ পর্যন্ত ঢাকা জোন-২ এ ৩৭১টি তালাকের মামলা আসে। এর মধ্যে পুরুষ কর্তৃক রেজিস্ট্রেশন করানো হয় ১১০টি। বাকি ২৬১টি মামলা নারী কর্তৃক রেজিস্ট্রেশনকৃত। একই জোনে জানুয়ারি ২০১২ থেকে ডিসেম্বর ২০১২ পর্যন্ত ১৭২টি তালাকের মামলা দায়ের করা হয়। এর মধ্যে ৫৯টি আসে স্বামীর পক্ষ থেকে, বাকি ১১৩টি স্ত্রীর পক্ষ থেকে।

আবার, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের দুটি এলাকায় ২০০৬ সাল থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত তালাক কার্যকর হয় ২৩০৯টি। এরমধ্যে ১৬৯২টি স্ত্রী কর্তৃক, আর ৯২৫টি স্বামী কর্তৃক। ২০১০ থেকে ২০১৪ সালের জুলাই পর্যন্ত তালাকের সংখ্যা ৩৫৮৯টি। এরমধ্যে ২৩৮১টি স্ত্রী কর্তৃক, আর ১২০৮টি স্বামী কর্তৃক। এই পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে দেখা যায়, তালাক দেয়া পুরুষ ৩০ শতাংশ, আর নারী ৭০ শতাংশ।

ঢাকা সিটি করপোরেশনের (উত্তর) জরিপ অনুযায়ী, ২০১৩ সালে তালাকের ৯৯.৩৫ শতাংশ নোটিশ দিয়েছেন স্ত্রীরা। ২০১২ সালে এ হার ছিল ৯৪.৫৫ শতাংশ। নারীর দিক থেকে তালাকের হার ৫ শতাংশ বেড়েছে। ২০১৩ সালে ৩ হাজার ৭৩২টি বিচ্ছেদের মধ্যে পুরুষের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেয়া হয় ২৪টি। ২০১২ সালে ৩ হাজার ১৩৯টি বিয়ে বিচ্ছেদের মধ্যে পুরুষের দিক থেকে উদ্যোগ এসেছে ১৭১টি, আর নারীদের পক্ষ থেকে ২ হাজার ৯৬৮টি। (সূত্র: ইন্টারনেট)

এবার তালাক বৃদ্ধির হার দেখুন।

সিটি করপোরেশনের সমীক্ষা থেকে দেখা গেছে, ঢাকা শহরে মোট ডির্ভোস নোটিশের পরিমাণ ২০০০ সালে ছিল ২৭৫৩টি, ২০০১ সালে ছিল ২৯১৬টি, ২০০২ সালে ছিল

www.pathagar.com

৩০৭৩টি, ২০০৩ সালে নোটিশ এসেছিল ৩২০২টি, ২০০৪ সালে ৩৩৩৮টি এবং ২০০৫ সালে ৫৫১১টি নোটিশ এসেছিলো।

মেয়েদের মধ্যে তালাক নেয়ার প্রবণতা কেনো বাড়ছে, তা নিয়ে আলোচনার আগে সামগ্রিকভাবে বিবাহ বিচ্ছেদ বৃদ্ধি পাওয়ার কারণের উপর আলোকপাত করা যাক। এর পেছনে দুটি মুখ্য কারণ রয়েছে বলে আমি মনে করি।

প্রথমত, সহনশীলতার অভাব। একজন মানুষের সাথে আরেকজন মানুষের মন-মানসিকতা পুরোপুরি মিলবে না – এটাই স্বাভাবিক। বৈচিত্র আছে বলেই এই পৃথিবী এত সুন্দর। আমরা কেউই স্বয়ংসম্পূর্ণ নই বলেই আমাদেরকে অপরের দ্বারস্থ হতে হয়। অথচ আমরা ধরে নিই, আমার জীবনসঙ্গী সম্পূর্ণ আমার মতো হবে, আমার কথা মতো চলবে, যা বলবো তা মানবে। এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণে পারস্পরিক বোঝাপড়া, সহনশীলতা ও ধৈর্যের পরীক্ষায় আমরা পরাজিত হই। সঙ্গীর সাথে সামান্য মতভেদ হলেই আমরা বলে উঠি, "যাও! চলে যাও! তোমার উপর আমি নির্ভরশীল নাকি?" কিংবা "তোমার সংসার তুমি সামলাও, আমি গেলাম।"

অথচ একটু আন্তরিক হলেই হয়ত এই মতভেদগুলো কাটিয়ে ওঠা যেত। ভিন্ন পথও বের করা যেত। তা না করে এ জাতীয় উক্তি করাটা যেন আমাদের কাছে সহজ হয়ে গেছে। আমরা ভুলে যাই, যে এক আল্লাহকে সাক্ষী রেখে আমরা একজনকে কবুল করে নিয়েছি, সেই আল্লাহ তালাককে উপযুক্ত কারণ সাপেক্ষে বৈধ করেছেন ঠিকই, তবে তিনি বিভিন্ন শর্ত (যেমন, মানসিক ও শারীরিক অবস্থা বিবেচনা, নির্দিষ্ট সময়সীমা ইত্যাদি) দিয়ে তালাকের প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন। কারণ এটা উভয়ের কারো জন্যই সুখকর কোনো বিষয় নয়। আর শয়তান সবচেয়ে বেশি খুশি হয়, যখন সে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোনো এক কারণে বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে।

দ্বিতীয়ত, আমাদের জীবনে কম-বেশি নাটক-সাহিত্য-কিংবা ফিল্মের প্রভাব পড়ে। ফলে আমরা নিজেকে নায়ক বা নায়িকার আসনে বসিয়ে কোনো এক রাজকুমারী বা রাজকুমারের স্বপ্নে বিভোর থাকি। নাটক-সিনেমায় খণ্ডিতভাবে শুধু বিয়ের রোমান্টিক দিকগুলোই তুলে ধরা হয়। আমরাও সেভাবেই কল্পনা করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। সেখানে একে অপরের প্রতি অধিকার বা দায়িত্বের কথা থাকে না। তাহলে কি নিছক রোমান্টিকতাই জীবন? আসলেই কি আমাদের ফিল্ম-নাটক প্রকৃত বাস্তবতা তুলে ধরে? এই জায়গাতেই আমরা হোঁচট খাই। প্রেম-ভালোবাসার রোমান্টিকতায় আমরা আগ্রহী হই, অথচ চাওয়া-পাওয়া, অধিকার দেয়া-নেয়ার প্রশ্নে আমরা গা-বাঁচিয়ে চলতে চাই। ভুলে যাই জীবনসঙ্গীর প্রতি দায়িত্ব পালনের কথা।

এদিকে, নারীর তালাক প্রদানের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রসঙ্গে অনেক সমাজবিজ্ঞানী বলছেন, "নারীরা দিন দিন শিক্ষিত হচ্ছে, উপার্জনক্ষম হচ্ছে। তাই তারা আর আগের মতো অত্যাচার সহ্য

www.pathagar.com

করে বসে থাকবে এমন নয়।" এসব কথার জবাবে বলতে হয়, অত্যাচার আগেও হতো, এখনো হয়। তবে পৃথিবীর রীতি সেই একই, ভালো মানুষরা (নারী হোক বা পুরুষ) নির্যাতিত হয়, আর খারাপ মানুষরা নির্যাতন করে। আইনও তৈরি হয় 'জোর যার মুল্লুক তার' – এই ভিত্তিতে।

যাই হোক, প্রথমেই আমাদের বুঝতে হবে, শিক্ষিত হওয়া মানে অহংকারী নয়, নিরহংকার হওয়া। শিক্ষিত হওয়া মানেই 'আমি এখন উপার্জনক্ষম' এই চিন্তার পরিবর্তে 'আমি এখন উপযুক্ত ও সচেতন ব্যক্তি' এই চিন্তা মাথায় রাখা উচিত। কথাগুলো কিন্তু নারী-পুরুষ সবার ক্ষেত্রেই বলছি। 'আমি উপার্জন করতে পারি' তাই 'আমার কারো প্রয়োজন নাই', এমন দৃষ্টিভঙ্গি অমূলক। অবশ্যই প্রতিটি মানুষের জীবনে একজন পার্টনারের দরকার আছে, ভালোবাসার দরকার আছে, একটা সহানুভূতির স্পর্শের দরকার আছে। এই পৃথিবীতে টাকা দিয়ে সব প্রয়োজন পূরণ করা যায় না। স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ হয়ে যাওয়ার পর অনেক সময় দেখা যায়, দৈহিক ও মানসিক চাহিদা পূরণের জন্য কেউ কেউ অন্য নারী-পুরুষের প্রতি ঝুঁকে পড়ে এবং বিয়ে না করেই অনৈতিক সম্পর্ক অব্যাহত রাখে। এতে উভয়েরই চরিত্র নষ্ট হয়।

আবার, আমাদের সমাজে তালাকপ্রাপ্ত চরিত্রসম্পন্ন নারী-পুরুষের পুনরায় বিয়ে হওয়াও খুব সহজ নয়। ক্ষেত্রবিশেষে পুরুষের জন্য কিছুটা সহজ হলেও নারীর জন্য বেশ কঠিন। যদিও ইসলাম বিয়েকে সহজ করার ব্যাপারে উৎসাহ দেয়।

আবার দেখুন, ধর্মীয় রীতি মেনে তালাক দেয়াটা একজন পুরুষের জন্য এক ধরনের আর্থিক ও মানসিক চাপ। কারণ, স্ত্রীকে প্রদেয় কোনো কিছু ফেরত নিতে আল্লাহ বারণ তো করেছেনই, সেই সাথে কিছু দিয়ে বিদায় জানাতে বলেছেন। আল্লাহ বলেছেন, "তোমাদের জন্য এটা কোনো অবস্থায়ই ন্যায়সংগত নয় যে, (বিয়ের আগে) যা কিছু তোমরা তাদের দিয়েছো তা তাদের থেকে ফিরিয়ে নেবে।" (সূরা বাক্বারা, আয়াত-২২৯)

এছাড়া তালাক বলার পর তা কার্যকরের সময়সীমা হলো তিন মাস। এই তিন মাস স্ত্রীর খরচ স্বামীকে বহন করতে বলা হয়েছে। আর স্ত্রী প্রসূতি হলে, কিংবা দুগ্ধপোষ্য সন্তান থাকলে এই সময়সীমা আরো বেড়ে যায়। এর আর্থিক চাপ পরে স্বামীর উপর। আমরা জানি না, কয়জন পুরুষ নিয়ম মেনে তালাক দেন। যদিও বাস্তবে দেখেছি, তালাকের পর স্ত্রীকে কিছু দেয়া তো দূরে থাক, স্ত্রী তার বাবার বাড়ি থেকে কিছু নিয়ে আসলে, স্বামী তাও রেখে দেয়। কী পরিমাণ ছোটলোকি!

আবার, 'আমি তো কামাই করতে পারি' এই মনোভাব কিংবা অন্য কারো দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নারীরা নিজেদেরকে স্বাধীন মনে করেন। সামান্য সন্দেহ বা মনোমালিন্যের জের ধরেই তারা খোলা তালাক নেন। অবশ্য, উপযুক্ত কারণ থাকলে ভিন্ন কথা। আমরা জানি না, কয়জন নারী ধর্মীয় নিয়ম মেনে খোলা তালাক নিয়ে থাকেন। কারণ, নিয়মমাফিক তালাক

www.pathagar.com

নেয়াটা হয় নারীদের জন্যও কষ্টকর। কারণ, এক্ষেত্রে স্বামী যেহেতু তালাক দিতে চাচ্ছেন না, স্ত্রী নিজেই বিচ্ছেদ চাচ্ছেন; তাই স্বামী কর্তৃক পরিশোধিত মোহরানা তিনি ফেরত চাইলে, তা ফেরত দিয়েই স্ত্রীকে তালাক নিতে হয়। অবশ্য, স্বামী ফেরত না চাইলে তা ভিন্ন বিষয়। যাই হোক, তালাক কার্যকরের পর একজন নারীর জীবন কি আদৌ সুখের হয়? কয়েকদিন না যেতেই তো মা-বাবা-ভাইয়েরা তাকে বোঝা মনে করে।

তাই বলে নারীদেরকে শত অত্যাচার সহ্য করে মুখ বুজে থাকার কথা আমি বলছি না। শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে অনেক পরিবারে নারী নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকেন, এটা একটা দুঃখজনক বাস্তবতা। এই নির্যাতনমূলক পরিস্থিতি থেকে নিজেকে অবশ্যই রক্ষা করা উচিত। আর আমরা বরাবরই তালাকপ্রাপ্ত চরিত্রসম্পন্ন নারী-পুরুষের বিয়ের পথকে সুগম করারও পক্ষে। যদিও আমাদের সমাজে তালাকপ্রাপ্ত নারী-পুরুষের বিয়ে সহজ নয়। তবে নারী-পুরুষ উভয়েরই একটা কথা অবশ্যই মাথায় রাখা উচিত, যেসব ছোটখাটো সমস্যা একটু আন্তরিক হলেই মিটিয়ে নেয়া সম্ভব, সেসব কারণে তালাক কার্যকর না করাই উত্তম।

কোনো কোনো নারী বলে থাকেন, 'সন্তানের দিকে তাকিয়ে আর তালাক নেয়া যায় না।' হ্যাঁ, আমরা জানি, সন্তানের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে বাবার চেয়ে মা-ই বেশি কষ্ট সহ্য করেন। তাই বলবো, সন্তান আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ামতস্বরূপ। তাই তাদেরকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করা এবং একটা সুন্দর পরিবেশ দেয়া উচিত। এ জন্য শুধু মা কিংবা বাবা নয়, উভয়কেই অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। সন্তান সবসময় মা-বাবা উভয়ের সৌহার্দ্যপূর্ণ বসবাস ও সাহচর্য চায়। সন্তানের এই ব্যাপারটা শুধু মা নয়, বাবাকেও বিবেচনা করা উচিত। আমরা অনেক সময় শুধু নারীকে সহনশীলতার পাঠ দেই। অথচ সেই হাদীসটা আমরা ভুলে যাই, যেখানে রাসূলুল্লাহ মুহাম্মাদ (সা) বলেছেন, "ঐ ব্যক্তি বীরপুরুষ নয়, যে অন্যকে ধরাশায়ী করে। সে-ই প্রকৃত বীর যে রাগের সময় নিজেকে সংবরণ করতে পারে" (বুখারী ও মুসলিম)। সমাজে এ ধরনের পুরুষ আমরা খুব কমই দেখি। উল্টো দেখা যায়, স্বামী উত্তেজিত হয়ে স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিচ্ছে। এটাকে স্বাধীনতা বলবো নাকি স্বেচ্ছাচারিতা? অতএব, তালাক কার্যকর করলে সন্তানের উপর এর কতটুকু নেতিবাচক প্রভাব পড়বে, তা মা-বাবা উভয়েরই বিবেচনা করা উচিত।

এবার আমি নারী-পুরুষের সহনশীলতার মূর্ত প্রতীকের দুটি উদাহরণ পাঠকের উদ্দেশ্যে তুলে ধরছি। নিশ্চয়ই সমাজে এ ধরনের আরো অনেক মানুষ রয়েছেন বলে আশা করছি।

১। আমার এক নিকটাত্মীয়। বিয়ে করেছেন প্রায় ২৫ বছর হবে। তিনি তিন সন্তানের জনক। ছোটবেলা থেকেই উনার পরিবারকে দেখে আসছি। আংকেলের জীবনের প্রতি আমার প্রচণ্ড আফসোস হয়। উনার স্ত্রী একেবারে দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যক্তি। স্বামী, সংসার বা সন্তানের প্রতি যে ন্যূনতম দায়িত্ব থাকে, সেটাও বোধ হয় উনার বিবেকে নেই। কোনো সাংসারিক কাজ

www.pathagar.com

করা তো দূরের কথা, মেহমান আসলে বরং স্বামীর দোষকীর্তন করতেই তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

অথচ স্বামী একেবারে চুপচাপ। নিজের কাজ নিজে করে যাচ্ছেন। সন্তানদের সকালে নাস্তা করানো, স্কুলে নিয়ে যাওয়া-নিয়ে আসা, কে কবে আসবে সেসব খবর রাখা, দুপুরে কর্মস্থল থেকে এসে সন্তানদের জন্য রান্না করা, একসাথে খাওয়া, রাতে সন্তানদের নিয়ে তাড়াতাড়ি ঘুমাতে যাওয়া, এই সকল কাজই তিনি করেন। বাবার ভালোবাসায় সন্তানরাও পাগল। এদিকে স্ত্রী সারাদিনই বক বক করে বাড়ি মাথায় তুলে রাখেন। কিন্তু তিনি চুপ থেকে নিজের কাজ করে যান। জানি না, কী পরিমাণ সহনশীল হলে একজন মানুষ এতটা উন্নত চরিত্রের অধিকারী হতে পারেন! সত্যিই তিনি শক্তিশালী পুরুষ!

২। আরেকটি পরিবারের ঘটনা। এখানে স্বামী সব ব্যাপারে নিজের সিদ্ধান্তকেই চূড়ান্ত মনে করেন। স্ত্রী কোনো ভালো পরামর্শ দিলেও 'মেয়ে মানুষ কম বুঝে' এ জাতীয় কথা বলে তার পরামর্শকে অগ্রাহ্য করেন। স্ত্রী যদি কখনো সরাসরি স্বামীর অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করে ফেলেন, তাহলে ঘর ছেড়ে দেয়ার মতো কাণ্ড ঘটিয়ে দেন স্বামী। তাই অনেক সময় স্ত্রী সবকিছু সহ্য করে নেন। তার কাছে যদি জানতে চাওয়া হয়, "আপনি স্বামীর কথার জবাব দেন না কেনো? তিনি তখন বেশ বিচক্ষণতার সাথে বলেন, "জবাব দিলে অনেকেই দেয়া যেতো। কিন্তু তুমি কি মনে করো ৩৩ বছরের সংসার এমনিতেই টিকে আছে? কত ত্যাগ, কত ধৈর্য লুকিয়ে আছে এর পেছনে! এখনকার মেয়েরা কি আর আমাদের মতো ধৈর্যশীল হবে?"

কয়েকমাস আগে পত্রিকায় পড়েছিলাম যুক্তরাষ্ট্রের একটি স্টেটে যেসব দম্পতি তাদের দাম্পত্য জীবনের ৫০ বছর পূর্ণ করেছেন, তাদেরকে এর স্বীকৃতিস্বরূপ পুরস্কৃত করা হচ্ছে। বিষয়টা তখন হাস্যকর মনে হয়েছিলো। কিন্তু পরে সমাজের বাস্তবতা উপলব্ধি করে এর মর্ম বুঝতে পেরেছি। আমাদের সমাজে যেভাবে তালাকের সংখ্যা বাড়ছে, তাতে করে দাম্পত্য সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে এখানেও কি প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে হবে?

www.pathagar.com

আমার বিয়ের সাক্ষাৎকার

প্রথমে পাত্রের ছোটবোন ও ভাবী পড়াশোনা, নামাজ ইত্যাদি প্রাথমিক বিষয়ে জানতে চান। তারপর পাত্রের সাথে নিম্নোক্ত কথোপোকথন হয়:

ছেলে: আপনি রান্না পারেন?

আমি: (মাথা নেড়ে) না সূচক উত্তর।

- পারেন না, নাকি পছন্দ করেন না? নাকি মা আছেন বলে...।

– না, আসলে আমি শুধু টুকটাক কিছু কেটে দেই। আম্মুই রান্না করেন।

– কাঁধে দায়িত্ব আসলে করবেন?

– ইনশাআল্লাহ করবো।

– আপনি সাজতে পছন্দ করেন না। তাই না? (ছেলে কেন এমন প্রশ্ন করেছে, তা পরে বুঝেছি। কারণ আমি ঘরে প্রবেশের আগেই আব্বু ছেলেকে গিয়ে বলে এসেছেন, 'আমার মেয়ে সাজে না'। তবে আব্বুর সেই কথাটা ছেলে নিয়েছে অন্যভাবে, মানে, 'সাজতে পছন্দ করে না'। এ আবার টাইপের মেয়ে!)

– পরপুরুষের সামনে আমি সাজি না।

– না, মানে ধরুন, একান্ত মহিলাদের কোনো আয়োজন। সেখানেও কি সেজে যান না?

– হ্যাঁ, তা যাওয়া যায়।

– কখনো কি সেরকম যাননি? আপনাকে কেউ সুন্দর বলুক, আপনি চান না?

– দেখুন, এখনকার বিয়ের প্রোগ্রামগুলোতে সাধারণত নারী-পুরুষ একসাথেই থাকে। তাই সে রকমভাবে তো সাজা যায় না। তাছাড়া আরেকটা কারণে আমি এসব থেকে দূরে থাকি। মেয়েরা পুঁজিবাদের বেড়াজালে বন্দি হয়ে পড়েছে। পার্লারে সাঁজগোজের পেছনে প্রচুর টাকা-পয়সা, সময় ও শ্রম ব্যয় করছে।

– (কিছুক্ষণ চুপ থেকে) আপনি পত্রিকায় লেখেন?

– হুম।

www.pathagar.com

– অফিসে গিয়ে লেখা জমা দিতে হয় নাকি?

– না, মেইল করে দেই।

– কোনো সাংবাদিক ফোরামের সাথে কি আপনি জড়িত?

– না।

– (কয়েক সেকেন্ড বিরতি) আপনি ইউসুফ আল কারজাভীর লেখা পড়েন?

– হ্যাঁ, পড়ি। অন্যান্যদের বইও পড়ি। আসলে আমি অমুকের লেখা পড়ি আর অমুকেরটা পড়ি না, তেমন নই।

– আচ্ছা, আপনাকে যদি লেখালেখি বন্ধ করতে বলি?

– আসলে লেখালেখির মাধ্যমে আমি সমাজের প্রতি আমার দায়িত্বটুকু পালন করতে চাই। যেমন, অন্যায়ের প্রতিবাদ করা। কু'রআন আমাদেরকে সত্যের পথে আহ্বান ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে বলেছে। অন্যায় দেখলে হাত দিয়ে বাধা দেবে, না হয় মুখে প্রতিবাদ করবে, না হয় অন্তত অন্তর দিয়ে ঘৃণা করবে – এই হাদীসটা তো আমরা জানি। আমি এই কাজটাই লেখালেখির মাধ্যমে করতে চাই।

– মানে, লেখালেখি বন্ধ করতে বললে আপনি করবেন না।

– না। তাছাড়া কোনো মানুষই তো পরিবারে সারাদিন ব্যস্ত থাকে না। একটা অবসর সময় থাকে। আমি সেই সময়টাতে এটা করতে চাই।

– হুম। বুঝলাম, সমাজ নিয়ে আপনি অনেক ভাবেন। তবে আমার ধারণা, ধর্মীয় লেবাসের আড়ালে আপনি আসলে ফেমিনিস্ট। প্লিজ, ডোন্ট মাইন্ড। আমি আসলে আপনার স্ট্রিক্ট ভাইভা নিচ্ছি। বিভিন্ন জায়গায় পরীক্ষা দিতে গেলে যেমনটি নেয়। তো...

– না, এতে সমস্যা নেই। তবে ফেমিনিস্ট বলতে সাধারণত যা বুঝানো হয়, আমি সে রকম একতরফাভাবে শুধু নারীর পক্ষে বলি না। আপনি অনলাইনে দেখতে পাবেন, অনেক নারী বেছে বেছে কু'রআনের সেইসব আয়াতের রেফারেন্স দেয়, যেগুলো আপাতদৃষ্টিতে পুরুষের বিপক্ষে যায়। কিন্তু আমরা তো জানি, 'অর্ধেক তার আনিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।' তাই পুরুষকে বাদ দিয়ে কীভাবে হবে?

– হুম। আপনি পড়ুয়া টাইপের, ঠিক?

- হুম।

– সারাদিন অফিস করে যখন আসবো, তখনোও কি বই নিয়ে থাকবেন?

– না, সেটা হবে কেনো?

www.pathagar.com

– আচ্ছা, একটা বিষয়ে বাস্তব উদাহরণ দিয়ে বলি। আমার এক বন্ধু তার স্ত্রীকে নামাজ-রোজা, মানে ফরজ কোনো কাজে নিষেধ করে না। কিন্তু তার বউ তাবলিগ করতে গেলে স্বামী নিষেধ করে। এক্ষেত্রে আপনি কি মনে করেন না যে, স্ত্রীর কম্প্রোমাইজ করা উচিত?

– আমি মনে করি, এক্ষেত্রে স্বামীকে কম্প্রোমাইজ করা উচিত। কারণ, স্ত্রী একটা ভালো কাজ করছে। তবে হ্যাঁ, স্ত্রীর যদি সমস্যা থাকে অর্থাৎ, তিনি যদি সাংসারিক দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন না করেন, তার বক্তব্যের অ্যাপ্রোচও যদি ভালো না হয়, তাহলে তার উপযুক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণের প্রয়োজন আছে। সেটাই আগে করা উচিত।

– না, আমার পয়েন্ট হলো, নিষেধ করার পর স্বামীর আনুগত্য করাই কি আবশ্যক নয়?

– আবশ্যক। তবে এতে স্ত্রীর মন খারাপ হবে। ফলে সাংসারিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে আগের মতো মনোযোগ নাও থাকতে পারে।

– (কিছুক্ষণ চুপ থেকে) আপনি তো সমাজ নিয়ে চিন্তাভাবনা করেন, পরিবার নিয়ে করেন না? যেখানে কু'রআনে বলা হয়েছে (তিনি আয়াতটি তেলাওয়াত করে অর্থ শোনালেন), "হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেরা বাঁচো, নিজেদের পরিবারকে বাঁচাও।" (সূরা তাহরিম: ৬)

– আসলে ঘরের কাজ কিন্তু সারাদিন থাকে না। আমি শুধু অবসর সময়ে সেসব করতে চাই। আপনি দেখবেন, অনেক মেয়েরা স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ করে সময় পেলেই টিভি দেখে। তাই না?

– আচ্ছা। আমার মতে, পৃথিবীতে দুই ধরনের মানুষ আছে: সাধারণ ও চরমপন্থী। আপনি নিজেকে কোন শ্রেণীতে ফেলবেন?

– আমি মধ্যমপন্থী। আপনি যাদেরকে 'সাধারণ' বলছেন, তারা মূলত এমন মানসিকতার, পৃথিবীতে এলাম, আর গেলাম। তারা কোনো ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা করে না। যেমন আমি মসজিদে মেয়েদেরকে দেখি, তারা নিজ দেশের ব্যাপারে বা দেশের বাইরে দুনিয়া জুড়ে কী হচ্ছে, এসব নিয়ে কোনো চিন্তাই তাদের মধ্যে নেই।

– আচ্ছা, আমার মনে হচ্ছে আপনি এক্সট্রিমিস্ট।

– আমি কীভাবে এক্সট্রিমিস্ট! যেখানে আপনিই বলছেন, লিখতে দিবো না, যেতে দিবো না, করতে দিবো না; সবকিছুতে না, না। তাহলে চরমপন্থী আমি নাকি আপনি?

– হা হা হা।

– আপনি নিজেই শুধু প্রশ্ন করে যাচ্ছেন, আমাকে কিন্তু সুযোগ দিচ্ছেন না।

– হ্যাঁ। বলুন, বলুন।

– আপনি কোন ধরনের জীবনসঙ্গী পছন্দ করেন?

www.pathagar.com

– ওই যে বললাম, 'সাধারণ'।

– (কিছুক্ষণ বিরতি) আপনার অবসর কাটে কীভাবে?

– বন্ধুদের সাথে আড্ডা, ফেসবুকিং, ঘুরাফেরা...

কিছুক্ষণ বিরতির পর...

ছেলে: আচ্ছা, শেষ একটা প্রশ্ন। পরিবার আগে নাকি সমাজ?

আমি: পরিবার।

– ওকে। গ্রেড দিলাম না, তবে আপনি পাশ। এবার আমাকে কি দেবেন?

– ভেবেচিন্তে দিবো।

– আপনার মা-বাবার পছন্দে রায় হবে নাকি আপনার পছন্দে?

– আমার পছন্দে।

* ২০১৫ সালের মে মাসের ৬ তারিখে এই কথোপকথন অনুষ্ঠিত হয়। ১২ জুন আমরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হই।

www.pathagar.com